পল্লীমঙ্গল

ও

গ্রাম সংগঠনের গোড়ার কথা

মধু বসু

ইকনমিক রুর‍্যাল ডেভলাপমেণ্ট সোসাইটি

প্রথম প্রকাশ ঃ
আষাঢ় ১৩৬৯

প্রকাশক ঃ
রুদ্রদেব মুখার্জী

সভাপতি,
ইকনমিক রুর‍্যাল ডেভলাপমেণ্ট সোসাইটি
৬ কিরণশঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
মলয় বসু

মুদ্রাকর ঃ
নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮ ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৬

॥ ভূমিকা ॥

ইংরাজী সন্ সত্তর দশকের এক সময়ে পশ্চিমদিনাজপুর জেলার তপন থানার কতগুলি অঞ্চলে দেখেছিলাম সেখানকার গ্রামগুলি কি পরিমাণে অনুন্নত এবং হতশ্রী।

মানুষগুলি দরিদ্র, নিরানন্দ এবং নানা কুসংস্কারে, নেশা ও কু-অভ্যাসে জড়িত। এ সব দেখে আমার মনে হত এই অন্ধকার থেকে এদের বুঝি মুক্তি অসম্ভব।

তারপর ঐ দশকেরই শেষাশেষি একদিন দেখলাম তপন থানার বালাপুরে কোন এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান তাদের অফিস বসিয়েছেন।

অবাক হয়ে দেখলাম তাদের প্রচেষ্টায় বালাপুর, ডাইং প্রভৃতি গ্রামে নতুনত্বের ছোঁয়া লেগেছে।

নতুন নতুন মাটির রাস্তাঘাট তৈরী হল, মজা পুকুর কেটে গভীর পুকুর হল, তাতে মাছ ছাড়া হল, পাড়ে পাড়ে কলা গাছ বসল।

হাঁসমুরগীর খামার করা হল, চাষীদের বাড়ীতে উন্নত জাতের গরু এনে চাষীরা গোয়ালে রাখল, আরও নানারকম অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গ্রাম যেন মেতে উঠল। এর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক আনন্দের আয়োজনও ঘটল, যেমন গ্রামে মেলা, গানের আসর, যাত্রা, ছায়াছবি, সরকারি রেডিও একেবারে চাষীদের আনন্দে ভাসিয়ে দিল। গ্রামগুলি যেন নবজীবন লাভ করল।

এসব ঘটনা আমার প্রত্যক্ষভাবে দেখা। এইসব কাণ্ডের গোড়ায় যিনি ছিলেন, তার নাম হল মধু বসু। উৎসাহী, সদাহাস্যময়, উন্নতদর্শন এক যুবক।

দেখেছিলাম গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি কেমন নিষ্ঠার সঙ্গে পল্লীমঙ্গলের কাজগুলি করতেন।

বর্তমানে তিনি "ইকনমিক রুর‍্যাল ডেভলাপমেণ্ট" সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত আছেন।

"পল্লীমঙ্গল ও গ্রাম সংগঠনের গোড়ার কথা" পুস্তকে তিনি নিজের মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথাই লিখেছেন।

মধু বসুর লেখায় সাবলীলতা ও সরলতা দুই-ই বর্তমান—অথচ কঠিন এক বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।

যে সমস্ত সংগঠন বা কর্মী পল্লীউন্নয়নের মতন কঠিন কাজে নামবেন বা নেমেছেন, তিনি ১৪টী অধ্যায় বা পদক্ষেপে তাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলেছেন।

মধু বসুর যুক্তি অকাট্য কারণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, ভাষা সহজ এবং গতিশীল অথচ মনোরম। এরকম একখানা বই বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আছে বলে আমার ধারণা।

সে দিক দিয়ে ধরলে মধু বসু বাংলা সাহিত্যের একটী অভাব পূরণ করলেন।

বইখানি আমাদের দেশের স্বেচ্ছাসেবী পল্লীসংগঠন কর্মীদের প্রভূত উপকার করবে এবং প্রেরণা দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি এই পুস্তকখানির বহুল প্রচলন কামনা করি।

কৈফিয়ৎ

দীর্ঘদিন গ্রাম উন্নয়নের কাজ করতে করতে অনেক সমস্যা, অনেক বাধাকে প্রত্যক্ষ করেছি। সেই সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করেছি গ্রাম তথা গ্রামের সব শ্রেণীর মানুষকে। গ্রামেরই কথা টুকরো টুকরো ভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখেছি। অনেক তরুণ-তরুণীই গ্রামের উন্নয়ন কাজে আজ স্ব-ইচ্ছায় এগিয়ে আসছে। একটা বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যদি প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে গড়ে তোলা যায় তাহলে এই অসম্ভব শক্ত কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যেতে পারে।

বেশ কিছুদিন ঘষা-মাজার পর আমার শুভানুধ্যায়ীদের ইচ্ছায় লেখাগুলি সংগ্রহ করে উন্নয়নের উপর একটি ছোট বই প্রকাশ করা গেল।

এ বই আমার তরুণ বন্ধুদের যদি সামান্য কিছু উপকারে লাগে তবেই এর মূল্য। গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে এর মূল্যায়ন হলে খুশী হবো।

নমস্কারান্তে

মধু বসু

বোড়াল

দক্ষিণ ২৪-পরগণা

পল্লীমঙ্গল ও গ্রাম সংগঠনের গোড়ার কথা

সূচীপত্র

শ্রীতুলসীচরণ বসু
শ্রীমতী লীলাবতী বসু
বাবা ও মায়ের চরণে
উৎসর্গীকৃত



শিক্ষা



শিক্ষা



স্বাস্থ্য



ঝিলমিল শিক্ষাকেন্দ্র



যৌথ উদ্যোগ



মহিলা মণ্ডল



খেলাধুলা ও সংস্কৃতি



সবজি চাষ



অর্থকরী প্রকল্প



পুকুর সংস্কার



মহিলা মণ্ডল

পল্লীমঙ্গল ও গ্রাম সংগঠনের গোড়ার কথা

আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক বাঁধন এত দুর্বল, এত অগোছালো যে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘটছে আমাদের নিদারুণ পরাজয়। চারপাশের বিশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থা ও অরাজক সময়ের নানান কঠিন সমস্যার চাপ আজ আমাদের জীবনে অশান্তি বয়ে এনেছে। অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিণত হয়েছে মারামারি, ভাংচুর ও রাজনীতির আখড়ায়। উৎপাদনমুখী কাজে লক্-আউট। খেলার মাঠে দুর্নীতি, সংস্কৃতির রাজ্যে বিকৃত রুচির মালমশলা, দেশজ শিকড়হীন উদ্ভট চিন্তাভাবনা ; রাজনীতিতে দলবদলের পাগলামী, স্বার্থপরতা, আজ সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরকে অসুস্থ ভয়াবহ করে তুলেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। স্বার্থ ছাড়া কেউ এক পা চলতে চাইছে না। নাগরিক জীবনের দুর্ভোগ ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উর্দ্ধগতির মতই, সময়ের অপব্যবহার, দুশ্চিন্তা, মানসিক অবসাদ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা সবকিছুই ক্রমশঃ বাড়ছে। পরিবারও ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে। ফলে মানুষ ক্রমশঃ মানুষেরই শত্রু হয়ে উঠছে। ঘরে বাইরে সর্বত্রই অশান্তি। এইসব পাহাড় প্রমাণ সমস্যা সমাধানের কোন সঠিক ব্যবস্থা নেই। ফলে নতুন সমস্যা তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো সমস্যাগুলিও স্থায়ীভাবে থেকে যাচ্ছে।

সাংগঠনিক দুরবস্থার এই হতাশাভরা চেহারা শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, গ্রামে-গঞ্জেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের যৌথ পরিবারগুলোতেও ভাঙন ধরেছে। সেখানে কৃষকের ছেলে চাষের কাজ করতে আজ ঘৃণা বোধ করে। একটা চাকরীর জন্য সে শহরের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়। গ্রামগঞ্জ থেকে সকলেই জেল্লা ও বিলাসের আকর্ষণে শহরে ছুটে আসছে এবং সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। শহর ও গ্রামের দুই ভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল তথা মানসিকতার টানা

পোড়েনের মধ্যে পড়ে গ্রামের মানুষ ক্রমশঃ দিশেহারা হয়ে পড়ছে। তাঁদের এই দিশেহারা অবস্থার সুযোগ বুঝে শহরের সুচতুর কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে।

অথচ গ্রামে যে সম্পদ আছে, গ্রামের মানুষ যদি তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে, গ্রামগুলোকে যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে চাঙ্গা করে নিতে পারে তাহলে কিন্তু পেটের জন্য তাঁদের শহরে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না। গ্রামগুলোকে সুস্থসবল করা গেলে তবেই তো শহরের দাম। তাই গ্রামের পুনঃগঠন নিয়ে আজ আমাদের ভাবতেই হবে। কারণ পৃথিবীতে ৫০০ মিলিয়ন মানুষ আজ ক্ষুধার্ত ও অজীর্ণ রোগগ্রস্ত; এবং সমগ্র পৃথিবীতে গ্রামের মানুষের সংখ্যাই ১০৩ মিলিয়ন। এই সব গ্রামবাসীদের ৯৮ শতাংশই দরিদ্র, যাঁরা অশিক্ষার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। অশিক্ষা ও অন্ধ কুসংস্কারের রাজ্যে বাস করছে। এদের মধ্যে আবার না খেতে পাওয়া মানুষের সংখ্যাই বেশী। এইসব মানুষদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়নমুখী সংগঠন গড়ে তোলা ও গ্রামে সত্যিকারের উন্নয়ন-মূলক কাজ করা খুবই কঠিন। তবুও এদেরই জন্য এবং এদেরকে সঙ্গে নিয়েই সংগঠনের কাজ শুরু করাই অন্যতম পথ।

সার্বিক গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্যটা হওয়া দরকার মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে—অর্থাৎ গ্রামের মানুষের সবচেয়ে আগে দরকার পেটের ভাত। এই পেটের ভাত কি ভাবে, কেমন করে যোগাড় করা যায় তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক এক সাংগঠনিক পরিকল্পনার কাঠামো।

সূচনাতেই বলে রাখি, বর্তমান লেখাটি আমার আলোচিত গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যক্তিগত দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত হলেও উন্নয়নমুখী গ্রাম সংগঠন পরিকল্পনার শেষ কথা নয়। উপরন্তু, এই পরিকল্পনার কাঠামোকে বাস্তবরূপ দেবার সময় পরিবেশ, চরিত্র, সমস্যা ও এলাকা অনুযায়ী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন অবশ্যই কাম্য।

প্রথম পদক্ষেপ :

পরিকল্পনার প্রাথমিক কাঠামো

গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনা কিভাবে তৈরী হবে ? কারা সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবে ? সত্যি করে কাদের জন্য পরিকল্পনা হবে ? কারা এই পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামিল হতে পারবে ? কাজ শুরু হবে কি ভাবে ? সংগঠন কি ভাবে তৈরী হবে ? ব্যাপক সমস্যা দেখা দিলে তার প্রতিরোধ বা সমাধান কি ভাবে হবে ? এইসব দরকারী বিষয় নিয়ে প্রথমেই বিস্তারিত ভাবে ভাবনা চিন্তা করা দরকার।

গ্রাম উন্নয়নের প্রাথমিক পরিকল্পনা কি ভাবে করা যেতে পারে প্রথমে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক। একটা সুন্দর স্বনির্ভর অর্থনৈতিক গ্রাম পুনঃগঠনের পরিকল্পনা গ্রামেরই মানুষ নিয়ে করতে হবে। এই সার্বিক গ্রামোন্নয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত—

আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন অর্থাৎ গ্রামের গরীব মানুষ কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

তিন শ্রেণীর মানুষকে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে—

(এক) যার কিছুই সম্পদ নেই।

(দুই) যার সামান্য কিছু আছে।

(তিন) যার বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ থাকলেও সেই সম্পদকে সে পুরোপুরি ব্যবহার করতে জানে না বা সদ্‌ব্যবহার করতে পারছে না।

এই তিন শ্রেণীভুক্ত মানুষের জন্য সত্যিকার বাস্তব ও প্রয়োজনীয় কি কি উন্নয়নমূলক কাজ করা যেতে পারে—যাতে এরা সারা বছর খাবার, কাজ, আশ্রয় এবং পরনের কাপড় পায়।

খসড়া প্রকল্পটি তৈরী করার আগে ঠিক করতে হবে নির্দিষ্ট

অঞ্চলের মোট ক'টি গ্রাম নিয়ে প্রকল্প তৈরী হবে। গ্রামগুলি পাশাপাশি বা কাছাকাছি থাকলে উন্নয়নের কাজ করতে সুবিধা বেশী। পাঁচটি কি দশটি গ্রাম নিয়ে প্রকল্প শুরু করা যেতে পারে। ছোট প্রকল্প সব সময় বড় প্রকল্পের চেয়ে বেশি ফলদায়ক। ছোট প্রকল্পে ভালভাবে গুছিয়ে কাজ করা যায় ও তার সব কিছুই আয়ত্বের মধ্যে রেখে এগোন যায়।

ধরা যাক্ দশটি গ্রাম নিয়ে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা করা হল। এবার ঐ দশটি গ্রামে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমীক্ষা চালাতে হবে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'মাইক্রো লেভেল সার্ভে' বা 'অনুস্তর সমীক্ষা'। এই সমীক্ষার মধ্যে থাকবে গ্রামের সমস্ত পরিবার তথা ব্যক্তির পূর্ণ ও পরিস্কার ছবি, এক কথায় পরিবারের বর্তমান ও নিকট অতীতের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য। পরিবারের কর্তার ও সদস্যদের নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বিশেষ দক্ষতা, বাস্তুজমির পরিমাণ, উঁচু নীচু জমির পরিমাণ, পুকুর, ডোবা, বিল, ঝিল, ইঁদারা, টিউবয়েল, বাড়ি ঘরের সংখ্যা, কম্পোষ্ট পিটের ব্যবস্থা, কি কি গাছপালা আছে, পতিত জমি কতোটা, বাস্তুতে মোট কয়টি পরিবার বাস করে, গৃহপালিত পশু কি কি ও কটা আছে? ঘরের আসবাবপত্র কি কি, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কত? সে জমির ধরণ কি? বর্তমানে কি কি চাষ হয়, কতখানি জমিতে পুকুর খাল কাটানোর সুযোগ আছে? জমি বন্ধক থাকলে বন্ধকী টাকার পরিমাণ কত? শর্তই বা কি কি? কৃষি কাজে ব্যবহারের যন্ত্রপাতি কি কি আছে—ইত্যাদি যাবতীয় খুটিনাটি তথ্য। এছাড়াও থাকবে—

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমুলক তথ্য ঃ

অর্থাৎ গ্রামে দম্পতির মোট সন্তান (স্ত্রী/পুরুষ) সংখ্যা, পরিবার নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, রোগ প্রতিষেধক টিকা নেওয়া হয়েছে কি না, জটিল বা দীর্ঘস্থায়ী রুগী কেউ আছেন কি না, চিকিৎসা কোথায় হয়, পরিবারের ক'জন শিশু প্রাথমিক বা অন্য কোন বিদ্যালয়ে পড়ে কি না—ইত্যাদি।

(খ) বর্তমান ঋণের পরিমাণমূলক তথ্য ঃ

ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, মহাজন ইত্যাদির সঙ্গে যা সম্পর্কযুক্ত।

(গ) পরিবারের বাৎসরিক পরিকল্পনামূলক তথ্য ঃ

দৈনিক এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিশেষ কোন মন্তব্য ইত্যাদি।

এইভাবে নির্দিষ্ট দশটি গ্রামের পরিবারভিত্তিক তথ্য ও বিস্তারিত বিবরণ যতটা সম্ভব সংগৃহীত হবার পর সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, গ্রামগুলির মোট এলাকা (স্কোয়ার কিলোমিটার) কতটা? মোট লোকসংখ্যা কত? কতজন নারী, পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ যুবক। কৃষিজীবি কতজন, কুটিরশিল্পী কতজন, উচ্চশিক্ষিত নিরক্ষর/অল্পশিক্ষিত কতজন, গ্রামের সম্পদ কি কি ; কি কি থাকা উচিত, তা তৈরী করা যাবে কি না? মোট চাষযোগ্য জমি কতটা? কারণ সাধারণত কৃষি কাজই মুখ্য জীবিকা এবং ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল গরম আবহাওয়ার দেশে চাষাবাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ জল, উন্নত মানের বীজ, সার, ঔষধ, হাল-বলদ, পাওয়ার টিলার, বাজার ইত্যাদি। এবং সর্বোপরি কৃষি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা।

এরপর দেখতে হবে ঐ সব জমিতে কি কি ফসল ভাল জন্মায় এবং তা এইসব অঞ্চলের বা অন্যান্য অঞ্চলের জন্য লাভজনক কি না। সব সময় লাভজনক চাষবাস (অবশ্যই প্রয়োজনভিত্তিক) করেই চাষীর আয় বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। কারণ এদেশের অধিকাংশ সাধারণ কৃষিজীবি গ্রাম বা পল্লী অঞ্চলেই বসবাস করেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ

সর্বহারার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

এতো গেল যাদের কিছু সম্পদ আছে তাদের কথা। কিন্তু যাদের একেবারে কিছুই নেই, তাদের জন্য কি ধরনের পরিকল্পনার কথা ভাবা যেতে পারে?

প্রথমেই সম্পদহীন শ্রেণীভুক্ত মানুষের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। দেখতে হবে তারা কিভাবে দিন গুজরান করে। হয়তো এদের মধ্যে কেউ পরের জমিতে কাজ করে অর্থাৎ মজুর খেটে পেট চালায়। কেউ সামান্য হাতের কাজ বা কুটির শিল্পের কাজ করে বা সবজী বেচে কোন রকমে বেঁচে আছে। এইসব প্রকৃত সর্বহারাদের জন্য গ্রামোন্নয়নের পটভূমিতে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলির কথা ভাবা যেতে পারে। যেমন :—

(১) মুরগী পালন (২) ছাগল পালন (৩) শূকর পালন (৪) গাইগরু পালন (৫) হাতের কাজ বা কুটির শিল্পের ব্যবসার জন্য সামান্য পুঁজি যোগাড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া (টাকার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বা কাঁচা মাল কিনে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত)। এসব প্রকল্পগুলি চালু করার আগে তাঁদের প্রয়োজনমত শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

(৬) ব্যাপকভাবে পুকুর, খাঁড়ি, বিল কাটানর পরিকল্পনায় গ্রামের বহু মানুষ কাজ পাবে সেই সঙ্গে গ্রামে সম্পদও সৃষ্টি হবে।

(৭) ভূমিহীনদের চাষের জন্য নিজস্ব কিছু জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া (হিসাব নিলে দেখা যাবে এক সময় অনেক কৃষি মজুরই যথেষ্ট পরিমাণে জমির মালিক ছিলেন। কিন্তু নানা অভাব অনটনে তাঁরা আজ ভূমিহীন কৃষি মজুর বা দিন মজুরে পরিণত হয়েছেন)।

(৮) ধান-কুটানী, বাঁশের কাজ, ধোকড়া ইত্যাদি দেশজ কুটির শিল্পের ব্যবসার পরিকল্পনা।

(৯) বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ; যেমন সেলাই মেশিন, তাঁতবোনা, কাঠের কাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি।

অর্থাৎ সমস্ত পরিকল্পনাটাকে এমনভাবে গড়তে ও চালু করার চেষ্টা নিতে হবে যাতে এরা সারা বছরই পেট ভরে খেতে পায় ও কাজ পায়—অর্থাৎ দারিদ্রের মোকাবিলা করতে পারে।

যাদের আছে ও যাদের নেই—এই দু ধরনের মানুষ ছাড়াও গ্রামে এমন অনেক মানুষ আছে যাঁদের সামান্য কিছু সম্পদ আছে। ধরা যাক্ এদের কারও ৫০ শতক কি ১ একর জমি আছে। কিন্তু সেই জমি বন্ধকী বা খাই-খালাসিতে দেওয়া আছে। প্রচণ্ড অর্থাভাবে নিজের কাছে জমিটুকু রাখতে পারেনি। এঁরা যাতে ঐসব চতুর মহাজনের খপ্পর থেকে নিজের সামান্য জমিটুকু ছাড়াতে পারে--সে চেষ্টাও সংগঠনকে নিতে হবে।

আয় বাড়াবার বিভিন্ন পদ্ধতি এইসব দরিদ্র মানুষদের হাতে কলমে শেখাতে, বোঝাতে হবে। কৃষি কাজে, গুটিপোকা চাষে, মাছ চাষে, পশু পালনে এঁদেরকে প্রয়োজনীয় পুঁজি, হাল বলদ, বীজ সার যোগাড় করে দিয়ে, সুপরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদত দিতে হবে। যাতে তারা সম্পদ ঘরে রাখতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আয় বাড়াতে পারে।

যাদের জমি আছে অথচ ফসল ফলাবার জল, সার, বীজ নেই বা সময়মত যোগাড় করতে পারছে না, তাদেরকেও মদত দিতে হবে। তাদের জমিগুলি পুরোপুরি ব্যবহার হলে উৎপাদন বাড়বে এবং স্বাভাবিকভাবে বহু কৃষিকর্মী কাজ পাবে। উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীকে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ১০ শতাংশ (অথবা ৭০ শতাংশ, ২৫ শতাংশ, ৫ শতাংশ) হারে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

গ্রামের চাষের কাজের জন্য জলের অভাব হলে শ্যালো বা অগভীর

নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে এই শ্যালো পাম্পের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, সেখানে অন্য কোন ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা চালাতে হবে। কারণ পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা না করলে চাষাবাদ হবে না; কৃষি উৎপাদনও হবে না। সুতরাং স্থানীয় পুকুর, খাল, খাঁড়িগুলির সংস্কারের কথা ভাবতে হবে। বৃষ্টির জলকে খরা এলাকায় ধরে রাখতে পারলে রবি শস্যের চাষও করা যাবে। খাঁড়ি থাকলেও ভাবতে হবে তার কাছাকাছি কোন নদী-নালা আছে কি না। থাকলে সেই নদীর সঙ্গে খাঁড়ির কোন সংযোগ করা যায় কি না। তা' যদি সম্ভব হয় তাহলে খাঁড়িতে সারা বছর জল থাকবে। প্রয়োজনে ঐ খাঁড়ির মুখে **স্লুইস গেট** বা বাঁধ তৈরী **করতে হবে।** এতে বর্ষার পর প্রয়োজনীয় জলটুকু খাঁড়িতে থেকে যাবে। তাছাড়া দেখতে হবে, ঐ সংস্কার করা পুকুর বা খাঁড়ির জল কতজনের কাজে লাগবে এবং যাদের কাজে লাগবে তারা আমাদের আলোচিত **ক, খ, গ** কোন শ্রেণীর **কৃষক। যদি সমষ্টির** বা দরিদ্র কৃষকদের সকলের উপকারে আসে তাহলে পুকুর বা খাঁড়ির সংস্কার করা যেতে পারে। এ সব কাজকর্ম সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একজন বা দুজনের উপর নির্ভর করেও এসব কাজকর্ম করা উচিত নয়। এর জন্য একটা গ্রামকমিটি গঠন করাই ভাল। গ্রাম কমিটির বিষয়ে আমরা এই প্রবন্ধের অন্য কোন অধ্যায়ে (পদক্ষেপে) আলোচনা করবো।

গ্রামের পিছিয়ে পড়া যে সব মানুষ সকল দিক থেকে বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত, যারা সময়মত কাজ পায় না, দুবেলা পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার পায় না, আশ্রয় পায় না—তারাই হল গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ। গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম ধারা অর্থাৎ গ্রাম সমীক্ষা থেকেই তাদের প্রকৃত সংখ্যাটা জানা যাবে। এঁদের জন্য গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য হবে—(১) অর্থ নৈতিক স্বনির্ভরতা (২) সামাজিক স্বনির্ভরতা (৩) সাংস্কৃতিক আত্মসচেতনতা।

বস্তুতঃ পরিকল্পনার মধ্যে সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য সব কিছুই থাকা উচিৎ, যেমন- শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খেলাধূলা,-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ইত্যাদি।

পরিকল্পনাকে তৈরী করার চেয়ে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়াটাই বেশী কঠিন। যে কোনও পরিকল্পনা এক একটি প্রাথমিক পরিকাঠামো ছাড়া কিছুই নয়। বিশেষ করে গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজের নির্দিষ্ট বা অভ্রান্ত কোন পরিকল্পনা বা ফরমূলা নেই। উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি যে কোন সময় অসুবিধার মুখে পড়তে পারে, ফলে পুরো পরিকল্পনাটাই বাতিল হয়ে যেতে পারে বা পরিবর্তন করা হতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও (যেমন বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প) সমস্ত পরিকল্পনাকে তছনছ করে দিতে পারে। অতএব পরিকল্পনাকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সংশোধন করতে বা পাল্টাতে প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিকল্পনার কাজ এমনভাবে শুরু করতে হবে যাতে অনেক বেশি দরিদ্র গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত উপকৃত হয়।

তৃতীয় পদক্ষেপ ঃ

তরুণ সংগঠন কর্মীর গুণাবলী ও গুরুত্ব ঃ

গ্রামের সবকিছু দেখে বুঝে, বিশ্লেষণ করে অনেক চিন্তাভাবনা ও পরিশ্রমের পর একটি প্রাথমিক পরিকল্পনার কাঠামো হয়তো বা খাড়া করা যাবে। এবার প্রশ্ন এই পরিকল্পনা কে বা কারা বাস্তবে রূপ দেবে ? তাদের সাংগঠনিক চিন্তাধারা বা দক্ষতা কতটুকু ও কেমন হবে ? আত্ম-নির্ভরশীল গ্রাম সংগঠন কিভাবে গড়ে উঠবে ? সমষ্টিগত কোন কাজ করতে গেলেই এই ধরনের যৌথ সংগঠন আগে গড়ে তোলা দরকার। অতএব সার্বিক গ্রাম উন্নয়নের পরিকল্পনাকে দাঁড় করানর পর দ্বিতীয় বড় কাজ হচ্ছে দক্ষ, সৎ সপ্রতিভ সংগঠন কর্মীর।

যারা শোষণহীন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন, দেশের সাধারণ মানুষের সত্যিকার মুক্তি চান এবং যারা অপরের স্বাধীনতাকে (স্বেচ্ছাচার নয়) বিশ্বাস করেন এই রকম চরিত্রের কর্মী বা মানুষকে একজোট হয়ে গ্রাম

উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এই ধরনের কাজে তাদের অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সংগঠনকর্মীদের মধ্যে সমস্ত বিভাগীয় কাজের দায়িত্বকে নাটকের দলের মত ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে কেউ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে বা হঠাৎ প্রকল্প বা সংগঠন ছেড়ে চলে গেলেও তার অভাবে যেন অন্যেরা সে কাজ চালাতে পারে। অর্থাৎ একজন স্বেচ্ছা-সমাজসেবী গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সংগঠন কর্মীকে প্রয়োজনে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নিজের কাজ ছাড়া অন্যের কাজের কিছুটা জানলে ব্যক্তি নির্ভরতার বদলে সমষ্টি নির্ভরতার মানসিকতা গ্রাম এলাকায় তৈরী হবে।

গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে তরুণ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী খুবই প্রয়োজন। এই বাহিনীকে সুশৃঙ্খল নিয়ম নিষ্ঠায় গড়ে তুলতে হবে। উন্নয়নমূলক সকল রকম অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব এদের হাতে দেওয়া যেতে পারে। বড় বড় আলোচনা সভা, গ্রামে গ্রামে যোগাযোগ রক্ষা, শান্তি রক্ষা, খেলাধূলা, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মুখ্য দায়িত্বও এঁরা নিতে পারে। এজন্য ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও প্রয়োজন আছে। প্রতি গ্রাম থেকে ২০/৩০ জন যুবক-যুবতীকে নিয়ে এই বাহিনী গড়া যেতে পারে। এই তরুণ কর্মীরাই মূলতঃ গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত বাস্তব রূপ দেবে।

মোদ্দা কথা, সবার আগে এই তরুণ কর্মীদের সংগঠনটিকে এবং সর্বোপরি তাদের মানসিকতাকে সৎ প্রাণবন্ত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ঐ সব কর্মীদের সব ব্যাপারে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে দেখাতে হবে। তারা যদি সব কাজেই পিছিয়ে পড়ে তবে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনাও স্বাভাবিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। তারা সুসংগঠিত থাকলে পরিকল্পনাও মজবুত হবে। কারণ সৎ ও দক্ষ কর্মী বাহিনীই গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণের মুখ্য উপাদান। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে সমষ্টি উন্নয়নের স্বার্থে তথা সংস্থার স্থায়িত্বের জন্যও ঠিক এই ধরনের কর্মী নির্বাচনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। দরিদ্র মানুষের

উন্নয়নকল্পে এই ধরনের কর্মীদের সত্যিকার জোট গড়ে উঠলে তবেই পরিকল্পনা সার্থকভাবে এগোবে। কর্মী নির্বাচন এবং সংগঠনের কাজ চলাকালীন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করাও দরকার। অনেক বড় বড় সংস্থার সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে—শুধু মাত্র অযোগ্য কর্মীদের জন্য। এই কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী সংগঠনের ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন কাজ। নিষ্ঠাবান সৎ কর্মী পাওয়া আজকের দিনে বেশ কঠিন ব্যাপার। এই ধরনের সংগঠন কর্মীর মধ্যে কিছু আবশ্যিক গুণ এবং দক্ষতা থাকা দরকার। **প্রথমেই দেখতে হবে কর্মীর মন যেন সর্বদা সমষ্টিগত চিন্তা ভাবনা করে।** নিজস্ব চেতনাবোধকে জাগ্রত করার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন কর্মী একজন অন্যজন সম্পর্কে ভাববে। গোষ্ঠী নিয়ে চলাফেরা করার কলাকৌশল তাদের শিখতে হবে। 'মানুষের উন্নতির জন্য কিছু করবো'—এই বলিষ্ঠ মানসিকতা নিয়ে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে সব রকম বিপদ ঝামেলার মোকাবিলা করতে হবে। শারীরিক ও মানসিক কষ্টকে সহ্য করতে শিখতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

প্রাথমিক ভিত হিসাবে তাদের আরও কিছু মানবিক গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। যেমন **ধৈর্য, সাহস, অধ্যবসায়,** নিরন্তর চেষ্টা, ব্যর্থতাকে স্বীকার করা, ভালবাসা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবোধ বিশ্বাসবোধ, ত্যাগ, উপকারের বিনিময়ে কোন কিছু আশা না করা, ভাল কাজে লেগে থাকা, শরীরচর্চা করা, সৈনিকের মত নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও কোন কিছু গড়ার স্বপ্ন দেখা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কোন মানুষের মধ্যেই এতগুলি গুণ একসঙ্গে থাকা সম্ভবপর নয়। তবুও যতটা সম্ভব সংগঠন কর্মীকে এইসব গুণগুলি আয়ত্ব করার চেষ্টা করতে হবে।

প্রাথমিক কাঠামো গড়ার কাজটাই সব থেকে বড় কাজ। সংগঠনের কর্মীরাই কাজটা প্রথম শুরু করবে। তাদের দেখে অন্য পাঁচজন শিখবে। কর্মী সংগঠন সঠিকভাবে গড়ে উঠলে অন্যান্য শাখা সংগঠন গড়া সহজ হবে।

সব দিক দিয়ে যারা উপযুক্ত, সপ্রতিভ তাদেরকে নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে। কাজ করতে করতেই 'প্রকৃত কর্মী সংগঠন' চলবে। যারা সত্যিকারের আন্তরিকতা ও ভালবাসার সঙ্গে কাজ করছে তাদের রাখতে হবে।

যারা এটাকে গতানুগতিক, মামুলী দশটা পাঁচটার চাকরী হিসেবে ধরে নিয়েছে তাদেরকে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম ও সিদ্ধান্তের বাইরে রাখতে হবে। এখানে দয়া মায়া বা আবেগের কোন স্থান নেই। *সমষ্টির স্বার্থে দরিদ্র সর্বহারা মানুষের স্বার্থে, সত্যিকার শক্ত সংগঠন* ও দক্ষ সমাজকর্মীর প্রয়োজনই বেশি।

আমার মতে অধিকাংশ তরুণদের নিয়েই গ্রামোন্নয়ন কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা দরকার। কারণ—**Youth is the season of hope, enterprise and energy to a nation as well as individual'**—ডব্লু, আর উইলিয়মের এই মূল্যবান উক্তিটি চিরসত্য।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্তের মত আমাদের দেশের অনেক বড় বড় কবি সাহিত্যিকেরা যৌবন বা youth এর জয়গান গেয়েছেন। সুভাষ বসু 'তরুণের স্বপ্নে'ও একথার উল্লেখ করেছেন। সব দেশে সব কালে সব সময়েই তরুণরা উচ্ছল, নতুনের পূজারী, সাহসী, যুক্তিবাদী, আশাবাদী, প্রগতিবাদী, প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী, অ্যাডভেন্চারপ্রিয়, বিশ্বস্ত, উৎসাহী, বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন এবং সৃষ্টিশীল। এরা বিরুদ্ধ শক্তিকে বা যে কোন বাধাকে সরাসরি চালেঞ্জ জানাতে পারে। উপরন্তু এরা অকপট, সহজ, সরল ও আত্মত্যাগী এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদেরকে গড়েপিটে নেয়। হিসাব নিলে দেখা যাবে জগতে সব বড় বড় কাজই তরুণ শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। তাছাড়া এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বয়সে প্রবীণ হলেও তরুণ তাজা মনের অধিকারী। ফলে তারা নিস্তেজ মনের কোন তরুণের থেকেও বেশী পরিশ্রমী।

আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে অধিকাংশই আজ নানা কারণে

অলস ও কাজকর্মের প্রতি নিরুৎসাহী। অল্প বয়সেই এরা বক্‌বক্‌ করে বেশী। ঘরকুনো। এবং নানা আজেবাজে মতলবে ঘুরছে। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—'দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে'। শুধুমাত্র মৌখিক জ্ঞান দিয়ে কাউকে মানুষ করা যায় না বা উৎসাহী করা যায় না। এদের তাই প্রকৃত ভাল কাজের মধ্যে ঠেলে দিতে হবে। নানান ধরনের উৎসাহজনক কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তরুণ ছেলে-মেয়েদের উন্নয়নমূলক কাজে টেনে আনতে পারলে বাকীরাও না এসে থাকতে পারবেনা। গ্রাম-গঞ্জের হাট, বাজার, চায়ের দোকান, পুকুরঘাট, গাছতলাগুলি তরতাজা তরুণ শক্তিকে দিন দিন পঙ্গু করে দিচ্ছে। এইসব অলস আস্তানা থেকে তরুণদের যত বেশী সরিয়ে আনা যাবে ততই মঙ্গল।

গ্রাম তথা দেশের উন্নয়নমূলক কাজে তরুণরা অংশগ্রহণ করলে দেশ ও দশের অগ্রগতি দ্রুত হবে। প্রতিটি অঞ্চলে এইসব তরতাজা তরুণদের ছড়িয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে দিতে হবে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব। সর্বোপরি তাদের মনে দেশ, মাতৃভূমি ও মানুষের প্রতি সুপ্ত ভালবাসাকে জাগাতে হবে। এই ব্যাপারে পুঁথিগত বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে আবেগ ও মমতায় ভরা মন থাকার প্রয়োজন বেশী।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমদিনাজপুর জেলার তপন থানার অন্তর্গত একটি স্বেচ্ছা-সমাজসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে যখন গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করা হয়েছিল তখন যে সমস্ত স্থানীয় অল্প পড়াশোনা জানা তরুণরা সেখানে কাজ করতে এসেছিল, তাদের বেশীরভাগই ছিল দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দিগ্ধ, ভীতু, রগচটা ও অপ্রতিভ। অনেকে ভাল করে কথাই বলতে পারতো না। নেশা-ভাং করতো। জুয়ো খেলতো। বলা যায় প্রায় প্রত্যেকেই গ্রমোন্নয়ন কাজের অযোগ্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদেরকে কাজ শিখিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, ভালবেসে, নতুন পথে যখন পরিচালনা করা হল, তখন তারা সবকিছুই ভালভাবে করার চেষ্টা করল, নেশা ছাড়ল, বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। তাদের ভিতরেও সুপ্ত

মানবিক ক্ষমতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল। এদের মধ্যে কেউ কেউ আজ সুন্দর লিখতে পারে, কেউ হিসেব রাখতে পারে। কেউ পাম্প মেশিন চালাতে ও মেরামত করতে পারে, কেউ গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে সংগঠনের কাজ করতে পারে—দরিদ্র মানুষকে সামাজিক ভাবে সচেতন করতে পারে। কেউ আবার বড় বড় সভা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—নাচ, গান, ইত্যাদিও চমৎকারভাবে পরিচালনা করতে পারে। এরাই আজ সুশৃঙ্খলভাবে সংস্থার প্রায় ৮০ভাগ কাজ নিজেরা সম্পন্ন করে। গ্রাম উন্নয়নের জন্য দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকে তরুণদের সংগঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ।

তরুণদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলেই গ্রাম উন্নয়নের কাজ সুষ্ঠভাবে করা যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে সুযোগ-সুবিধা গেলে ভালবাসার সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে অনেক অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়।

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—বিবেকানন্দের এই অমরবাণী—গ্রামোন্নয়ন কর্মীদের মনে প্রাণে গেঁথে কাজে নেমে পড়তে হবে। মানুষকে ভাল না বাসলে জগতে কোন ভাল বা বড় কাজ করা সম্ভব নয়। এই ভাবেই যে গ্রামোন্নয়ন সংগঠন গড়ে উঠবে সে সংগঠনের দায়িত্ব দরিদ্র মানুষরাই ভবিষ্যতে বহন করবে। এবং তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবে গ্রাম কমিটির পরিচালক বা সম্পাদক। সম্পাদকদেরও যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। অর্থাৎ কেমন করে গ্রাম কমিটি চালাতে হবে, হিসাবনিকাশ করতে হবে কিভাবে, শিক্ষণীয় ক্লাশে কি কি নিয়মিত করতে হবে তা আলোচনা করতে হবে। এছাড়াও গ্রামের পরিকল্পনা কিভাবে তৈরী হবে, কিভাবে দায়িত্ব ভাগ হবে, কিভাবে গ্রামে কাজ শুরু হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় সবকিছু ভালভাবে জানতে ও শিখতে হবে।

চতুর্থ পদক্ষেপ ঃ

সংগঠন কর্মীদের দায়িত্ব ও তার প্রভাব ঃ

গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্যাপক ভাবে মানসিক পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেও দেখাতে হবে। একতাই বল। একসাথে যদি না সবাইকে জড়ো করা গেল, যদি না অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসাথে রুখে দাঁড়ানো গেল, যদি না জোট বেঁধে কাজ করা গেল—তবে কিসের সংগঠন ? কথায় বলে—'দশের লাঠি একের বোঝা।'

প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম গ্রামের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষকেও খুশী করতে পারে। তারা অর্থনৈতিক সহযোগিতাও করতে পারে। সার্বিক গ্রামোন্নয়নের জন্য তাদেরও সংগঠনে যুক্ত করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সব কাজের সেরা এবং শক্ত কাজ হল গ্রামোন্নয়নের কাজ। এর জন্য আগেই চাই মজবুত একটি সংগঠন। সেই সংগঠনের জন্য চাই গ্রামের মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। প্রকল্পের কাজগুলিতেই গ্রামের মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামিল করতে হবে। তারা যেন বোঝে এ প্রকল্প তাদেরই নিজেদের প্রকল্প। তারাই প্রকল্পের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রতিটি গ্রামকমিটিকে সব সময় সতেজ ও চাঙ্গা রাখতে হবে। যে কমিটি কাজে পিছিয়ে পড়বে তার কারণ অনুসন্ধান করে আবার সেই কমিটিকে দাঁড় করাতে হবে।

গ্রাম সংগঠন গড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম সভ্যদের শিক্ষার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সংগঠনের মূল শক্তি যোগাবে শিক্ষা। এখানে 'শিক্ষা' বলতে বি, এ, এম, এ, ডক্টরেট ইত্যাদি উচ্চশিক্ষার কথা বলছি না। এই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নিজেকে ভালভাবে বুঝতে হবে। গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দেওয়া, লাভ লোকসানের হিসাব বোঝান, কারিগরি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া, গ্রামের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা, গ্রামের ও ব্যক্তিগত সম্পদ কিভাবে

রক্ষা করা উচিৎ তার শিক্ষা দেওয়া, পরিবারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করা ইত্যাদি একের পর শেখাতে হবে। সোজা কথা নিজেদের সমস্যাকে নিজেদেরই দূর করার, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও আত্মসচেতন হবার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা আরও কি কি পর্যায়ের হতে পারে তাও সব সময় ভাবতে হবে।

গ্রামের মানুষের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে চিন্তা ভাবনার শক্তি ও অভ্যাসকে জাগাতে হবে। একজন যেন অন্যজনের জন্য ভাবে। যে কাজে বহু লোকের উপকার হবে, সেই কাজটাই করতে হবে। মুষ্টিমেয়র সুবিধার জন্য সমষ্টির অসুবিধা কিছুতেই করা চলবে না। গোষ্ঠী নিয়ে চলাফেরার শিক্ষা দেওয়া, অন্যের জন্য কিছু করবো, এই রকম মনোভাব সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। গ্রামে হঠাৎ কোন বিপর্যয় বা বিপদ ঘটলে কেমন করে তা থেকে বাঁচতে হবে বা কিভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে তাও শেখাতে হবে।

শস্য উৎপাদন দশগুণ বাড়িয়ে, গ্রামের মানুষকে পেট ভরে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই অনুন্নত গ্রামগুলির সমস্যা মিটবে না—বরং বাড়বে। কারণ ভোগ করারও কায়দা-কানুন আছে। যে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে থাকে, তাকে হঠাৎ একগাদা পোলাও কালিয়া খাওয়ালে তার সর্বনাশই করা হবে। সেই জন্যই গ্রামের সমষ্টি উন্নয়নের জন্য যা খরচ করা হবে তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেমন দেওয়া বা নেওয়া চলবে না, তেমনি যা লাভ হবে তার অপব্যবহার করাও চলবে না। সবসময় বুঝে সুঝে পরিমাণ করে মিতব্যয়ী হয়ে চলতে হবে। এইভাবে আত্মসম্মানবোধ তথা আত্মনির্ভরশীলতা ক্রমশঃ জেঠে উঠবে। সব সময় ভাবতে হবে—'আমি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের একজন নাগরিক। আমারও অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। টাকা মানুষের চেয়ে বড় নয়। টাকা মানুষকে তৈরী করে না, মানুষই টাকাকে তৈরী করে।' মোদ্দা কথা হল—সবার উপর মানুষ বড় তাহার উপর নাই।

মানুষের জন্য সবকিছুই করা যায়। এই যে নদীতে বাঁধ তৈরী হচ্ছে, মাঠে চাষবাস হচ্ছে, রাস্তা তৈরী হচ্ছে, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে সবই'ত মানুষ করছে মানুষেরই জন্য। সুতরাং যোগ্য মানুষ গড়তে পারলে যোগ্য দেশও গড়ে উঠবে। প্রতিটি মানুষ যদি নিজের সমস্যা বুঝতে ও ঘোচাতে সক্ষম হয় তবে এ পোড়া দেশের অনেক সমস্যাই দূর হয়ে যাবে।

মানুষকে ভিত্তি কবেই একটা দেশ ও তার চরিত্র গড়ে উঠে। অনুন্নত গ্রামের মানুষদেব গণচেতনামূলক শিক্ষা প্রতি মুহূর্তেই গ্রহণ করতে হবে। তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেবার দায়িত্বও গ্রাম-সংগঠক কর্মীদের। গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও সংগঠক কর্মীদের অনেক কিছু শেখার আছে। মূলত আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই গ্রামোন্নয়নের কঠিন পথে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। যে কর্মী ভালবাসার বন্ধন যত শক্ত হাতে বাঁধতে পারবে তার সংগঠনও হবে সবচেয়ে দৃঢ় ও মজবুত।

গ্রামের দরিদ্র, অবহেলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের টাকা দিয়ে বা কিছু সুযোগ সুবিধে পাইয়ে দিয়ে তাদের অভাব অনটন চিরদিনের জন্য দূর করা যাবে না। সে চেষ্টা না করাই ভাল। কিন্তু হৃদয় দিয়ে, ভালবেসে সহানুভূতি জানিয়ে, মানুষের বিপদের সময় পাশে উপস্থিত থেকে মানুষকে আরও নিকট আত্মীয় করে নেওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যাদের সঙ্গে মনের মিল, কাজের মিল, জীবন পথে চলার মিল ও প্রেরণা খুঁজে পাওয়া যায়, তারাই আমাদের প্রকৃত আত্মীয়, প্রকৃত সহকর্মী তথা সহ যোদ্ধা।

যে কোন গ্রামে পরিকল্পনা করা হোক না কেন সংগঠন কর্মী যারা হবে তারা যেন সেই গ্রামের বা কাছাকাছি অঞ্চলের বাসিন্দা হয়। তাহলে ভাল হয়। কারণ স্থানীয় কর্মীর মনে স্বভাবতই তার গ্রামের প্রতি ভালবাসা, মমতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা থাকবে। তার উৎসাহে গ্রামের অন্যান্য ছেলেরাও উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবে। এতে কাজটা সহজ হয়ে উঠবে। আনুষঙ্গিক খরচও কম

হবে। সুতরাং গ্রামোন্নয়নের কাজে কর্মীদের বেশীর ভাগই স্থানীয় বাসিন্দা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রামের তরুণরা গ্রাম উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করলে বেকার সমস্যাও কিছুটা দূর হবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম আপনিই জোরালো হবে। ভবিষ্যতে তারাই কারুর কোন সহযোগিতা ছাড়াই প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবে। সর্বোপরি কাজকর্মের মধ্যে থাকলে তাদের মনটাও ভাল থাকবে। বাজে চিন্তায় মন যাবে না। হতাশ ভাব দূর হবে। যুব শক্তির অপচয় হবে না। ওদের শক্তি দেশ ও সমাজ গড়ার কাজেই লাগবে।

ব্যক্তি মানুষের সঞ্চয় প্রকল্পকেও সংগঠনের মাধ্যমে গ্রাম-গঞ্জে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রশ্ন উঠবে, যে মানুষ কাজ পায় না, খেতে পায় না, সে কেমন করে সঞ্চয় করবে ? আমাদের উত্তর হল—এই শ্রেণীর মানুষ যখনই কাজ পেলো, উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করল, পেট ভরে খেতে পেল, হাতে কিছু কাঁচা পয়সাও পেল—তখনই তাঁকে শেখাতে হবে—সে কেমন করে, সঠিক অর্থে তার অর্থ বা সম্পদকে ভোগ করবে। এবং তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা সঞ্চয়ও করবে। দরিদ্র মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা এলে সে যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে বেহিসেবী খরচ করে ফেলে। সে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে, বাড়তি অর্থ সঞ্চয় করে রাখে সেদিকে সংগঠন কর্মীদের লক্ষ্য রাখতে হবে। ধর্মগোলা/পোষ্ট অফিস/ব্যাঙ্ক/বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে সে সঞ্চয় করতে পারে। সঞ্চয়ের অভ্যাস তথা মানসিক সচেতনতা গড়াটাই বড় কথা। প্রতিটি অনুন্নত গ্রামে দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় করাটা বাধ্যতামূলক করা দরকার।

এক টাকা সঞ্চয় করা মানে এক টাকা আয় করা। সঞ্চয়ের এই মূলমন্ত্রকে মনে রেখে 'ব্যক্তি সঞ্চয় প্রকল্প' 'সমষ্টি সঞ্চয় প্রকল্প' প্রতিটি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে চালু করার চেষ্টা করতে হবে। 'ধর্মগোলা' প্রতি গ্রামের মস্ত বড় সহায়। খরা, বন্যা বা নানান বিপদ আপদের সময়

ধর্মগোলার কৃষিসম্পদ গ্রামের খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষকে রক্ষা করবে।

ধর্মগোলার প্রয়োজনীয়তার একটা বাস্তব উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমদিনাজপুর জেলায় যে ভয়াবহ খরা হয় (গত ৫০ বছরের মধ্যে এমন খরা এখানে হয়নি) তখন তপন থানা প্রকল্পের ধর্মগোলায় কৃষিসম্পদ রক্ষা করা হয়েছিল বলে আশেপাশের ৫০টি গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা খেয়ে পরে বেঁচেছিল। ঐ ধর্মগোলায় মোট ৪০০ কুইণ্টাল ধান রাখা হয়েছিল। ঐ ধান সংগ্রহের সময় স্থানীয় অঞ্চলে ধানের বাজার দর ছিল ২০ টাকা মণ (২৮ কেজি) প্রকল্প অফিস আরও ১০ টাকা বেশী দিয়ে (২০ + ১০) ৩০ টাকা দরে তখন ধান কিনে রেখেছিল। খরার সময় ঐ ধানের দর বেড়ে দাঁড়াল ৪৮/৫০ টাকা। সেই দারুণ বিপদের সময় প্রকল্প অফিস স্থানীয় গরীব কৃষকদের মাত্র ৩২ টাকা দরে ধান ঋণ বাবদ দিয়েছিল। ধর্মগোলার মাধ্যমে সঞ্চয় প্রকল্পের জন্যই কৃষকরা সেদিন তাদের পরিবারসহ খেয়ে পরে বাঁচল। ক্ষেত থেকে নতুন ধান উঠলেও গরীব কৃষকদের ঘরে ধান মজুত রাখার সুবন্দোবস্ত নেই বলে তারা ধান ঠিকমত সঞ্চয় করে রাখতে পারে না।

বাধ্য হয়ে অনেকে তাই অসময়েই নামমাত্র দামে খোলা বাজারে সব ধান বেচে দেয় এবং পরে লোকসানের মধ্যে হাবুডুবু খায়। অতএব গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে ধর্মগোলা চালু হলে তাদের নিজেদের সম্পদ তারা ধরে রাখতে পারবে। এবং বিপদের দিনে ব্যবহার করতে পারবে। গ্রামে গ্রামে ধর্মগোলা গড়ে তুললে কৃষকদের আর মহাজনদের দারস্থ হতে হবে না।

সঞ্চয় সংক্রান্ত বা ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাব নিকাশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাখা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমষ্টিগতভাবেও রাখা প্রয়োজন। গ্রামের মানুষ তার যাবতীয় হিসাব নিকাশ যথাযথভাবে রাখতে শিখলে, তাদের নিজেদেরই উপকার সবচেয়ে বেশী। তার কত আয় হচ্ছে, কত ব্যয় হচ্ছে, কি কি বিষয়ে খরচ হচ্ছে, কোন বিষয়ে খরচ কম বেশী হচ্ছে ইত্যাদি। এরকম বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ গ্রামের দরিদ্র মানুষরা

করতে পারলে তাদের আর্থিক উন্নতি চটপট্ হওয়া সম্ভব। দেখা যাচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সব ক্ষেত্রেই এসে পড়ছে। জীবনে উন্নতির ধারক ও বাহক হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সমষ্টিগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন চালাতে গেলে প্রয়োজন নিখুঁত হিসাবপত্র রাখা—যা যে কোনও উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।

পঞ্চম পদক্ষেপ ঃ

সংগঠন ও গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য ঃ

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা শরীর ও স্বাস্থ্যের দিকে একেবারেই নজর দিতে পারে না, একেই তো তারা তুবেলা ঠিকমত খাবার জোটাতে পারে না। বাল্যকাল থেকেই অপুষ্টিতে ভোগে। তার উপর যদি নানা কঠিন রোগ ব্যাধি তাদের আক্রমণ করে তো তাদের মৃত্যু ছাড়া উপায় কি ?

এ দেশের গ্রামে-গঞ্জে উপযুক্ত চিকিৎসালয় ও ডাক্তার পাওয়া এক তুর্লভ ব্যাপার। গ্রামাঞ্চলে সরকারী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র যা তৈরী হয় এবং বছরের পর বছর সেগুলি চালু না হয়ে পড়ে থাকে—শিয়াল, কুকুর চামচিকের আবাসস্থল হয়। ডাক্তারদের গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। ফলে গ্রামের মানুষ ঔষধের অভাবে, সুচিকিৎসার অভাবে মারা পড়ে। এরা সাধারণতঃ সর্দি-কাশি, ঘা, প্যাঁচড়া, পেটের রোগ, ফুসফুসের রোগ, গা-হাত পা ফোলা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে পিছিয়ে পড়া গ্রামের ৯০ শতাংশ দরিদ্র গ্রামবাসী দীর্ঘকাল ধরে কোন না কোন রোগে ভুগছে।

আসলে এই সব গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যবিধি একেবারেই জানে না। অস্বাস্থ্যকরভাবে তারা বসবাস করে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলে। পায়খানা করে। নিজের শরীর ও পরিবেশ তুই-ই নোংরা অপরিস্কার রাখে।

সবাই যে অর্থনৈতিক কারণে এসব করে তা নয়। যারা শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন তারাও স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেন না। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে গ্রামের গর্ভবতী মহিলারা প্রসবকালে যে কতজন মারা যান তার লেখাজোখা নেই। গ্রামের যে কোন ধাত্রীরাও বৈজ্ঞানিক প্রথায় গর্ভবতী মহিলাদের সুষ্ঠুভাবে প্রসব করাতে পারে না। অনেকে আবার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করার জন্য গাছ-গাছালির নানা শিকড়-বাকড় খেয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনেরই বিপদ ডেকে আনে। অনেকে আবার মন্দিরে, মসজিদে মাথা কুটে মরে রোগ সারাবার জন্য। গ্রাম্য কুসংস্কারে তারা আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। তাই গ্রামে ডাক্তার পাওয়া না গেলেও প্রাথমিক ও সহজ স্বাস্থ্যবিধিগুলি—যথা ঘরদোর পরিস্কার রাখা, পরিস্কার জামা-কাপড় পরা, যেখানে সেখানে থুতু বা বিষ্ঠা ত্যাগ না করা, পুকুরের জল ফুটিয়ে খাওয়া, নোংরা জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো ইত্যাদি— গ্রামবাসীদের শেখাতেই হবে। আগে থেকে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি কিছু কিছু পালন করলে রোগ পীড়া সহজে আক্রমণ করতে পারবে না। ডাক্তার বা ঔষধপথ্য কোনটাই না পাওয়া গেলে গ্রামবাসীদের সাধ্যের মধ্যেই যা কুলোবে সেইটুকু ব্যবস্থাই গ্রহণ করা উচিৎ।

গ্রামের ধাত্রীদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করে স্বাস্থ্যবিধির নারসিং বা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দিয়েও কাজ করার চেষ্টা করা যায়। অসহায় হয়ে, অলস হয়ে চুপচাপ বসে থাকলে কোন কাজই সম্ভব হবে না। নিরন্তর চেষ্টাই এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র লক্ষণ। স্বাস্থ্য বিধির ক্ষেত্রেও একথা খাটে।

ষষ্ঠ পদক্ষেপ ঃ

গ্রামোন্নয়নের সমস্যা ও তার মোকাবিলা ঃ

জীবনটা নানা সমস্যায় ভরা। সমস্যাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা জন্মেছি। ফলে গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজেও প্রচুর সমস্যা ও বাধা থাকবেই। সমস্যা

যদি না দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হবে উন্নয়নমূলক কাজ এখনও শুরু করা হয়নি। গ্রামোন্নয়নের কাজ করার সময় কোন কোন সমস্যার বিরুদ্ধে আমাদের মোকাবিলা করতে হতে পারে, সে সম্পর্কে এই অধ্যায়ে (অনেক গতানুগতিক সমস্যা থেকে বড় কয়েকটিকে বেছে নিয়ে) আলোচনা করা যাক।

অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

উৎপাদন নেই, বাজার নেই, জমিতে সার নেই, জলও নেই, সারা বছর কাজ নেই, গ্রাম্য নানান কুসংস্কার, হিংসা, গ্রাম্য দলাদলি, অসামাজিক কাজ, চুরি ডাকাতি, মামলা মকদ্দমা, অজ্ঞতা, ছিনতাই, মাতলামি, মারামারি ইত্যাদি ছাড়াও শিক্ষার অভাব, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, পানীয় ও সেচের জলের অভাব ইত্যাদি বহু সমস্যা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও আছে দুটি বড় প্রাকৃতিক সমস্যা খরা ও বন্যা। এইসব সমস্যা থেকে দরিদ্র মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো অত্যন্ত শক্ত কাজ।

শহর ও গ্রামের এক ধরনের চতুর মানুষ গ্রামীণ সমস্যাগুলিকে চিরদিন টিকিয়ে রেখে গরীব মানুষকে সেই সমস্যার আখ-মাড়াইর কলে ফেলে শোষণ করে নিজেদের স্বার্থরস আহরণ করে। এদের ভয় করলে কাজ করা যাবে না। **ভয়-ভীতি উন্নয়ন কাজের বিষম শত্রু। যেখানে সত্য, সেখানে ভয় নেই। যেখানে অসত্য ভয়টাতো সেখানেই।** সমস্যাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিতেই হবে। পরিকল্পনা রচনা করে আগে ভাগেই সাবধান হতে হবে। ধরা যাক, দেশে হঠাৎ বন্যা বা খরা হল, এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সমস্যা থেকে উদ্ধারের রাস্তাটাই বা কি ? সেতু তৈরী করে, খালবিল, নালা ইত্যাদি দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ; দেখতে হবে খরার সময় বিকল্প জল সরবরাহের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রামে নেওয়া হয়েছে। আকস্মিক বিপর্যয়ের জন্য খাদ্যের যোগান মজুত আছে কিনা তাও দেখতে

হবে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতেব মধ্যে থেকেই সমস্যাকে মোকাবিলা করার শক্তি অর্জন করতে হবে।

গ্রাম উন্নয়নের সমস্যা আমাদের বহু কিছু শেখাবে। যে কাজে সমস্যা নেই, উত্থান পতন নেই সেখানে কিছু শেখারও নেই। সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য চাই অফুরন্ত সাহস; আর চাই পরিশ্রম ও নিষ্ঠা।

সমস্যাকে বন্ধু হিসাবে নিলে উন্নয়নে যুক্ত কর্মীরা প্রতিটি সমস্যাকে চিনতে ও বুঝতে পারবে। সাধারণ মানুষ সমস্যাকে ভয় পায়। বিশেষ করে গরীব মানুষেরা। তাই ক্রমাগত সাহস আর প্রেরণা দরিদ্র গ্রাম-বাসীদের দেওয়া দরকার।

গ্রাম-উন্নয়নমূলক কাজে নানান বিরোধিতা বা বাধা আসবেই। বিরোধিতা আর এক বড় সমস্যা। আমরা মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে বিরোধিতার রূপ আলোচনা করতে পারি।

(এক) স্থানীয় মাতব্বরদের বিরোধিতা।

(দুই) মহাজন/ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা।

(তিন) রাজনৈতিক বিরোধিতা।

(চার) নিজের সংগঠনের কর্মিদের এবং অন্যান্য সমধর্মী সংগঠনের বিরোধিতা।

সব গ্রামে, সব পাড়ায়, একজন দুজন করে স্থানীয় মাতব্বর আছেই। মাতব্বররা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর এবং ভোগবাদী। এরা গ্রামের বা পাড়ার মধ্যে গায়ের জোরে প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে মারপিট চেঁচামেচি, মামলা-মোকদ্দমা করে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের সব সময় দাবিয়ে রাখে। গ্রামে যারা এদের কথা শোনে না, তাদের উপর নানাভাবে শারীরিক, মানসিক উৎপীড়ন চলে। গ্রামবাসীদের উপর এরা অন্যায় অত্যাচার করলেও এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে কেউ সাহস করে না।

গ্রামের মাস্তান/মাতব্বরদের বিরুদ্ধে গরীব মানুষরাও ভয়ে কিছু বলতে পারে না। তারা জানে মাতব্বরদের কথা না শুনলে মাতব্বররা

গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে, ধান কেটে নিয়ে, জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে, মারধর করে, নানান ব্যাপারে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে চরম প্রতিশোধ নেবে। জুলুম ও অত্যাচারের আতংকে গ্রামের দরিদ্র মানুষরা ক্ষমতাবান মোড়ল, মাতব্বর মহাজনদের ভীষণ ভয় করে থাকে। মুখ বুজে ওদের সব অত্যাচার সহ্য করে। সাধারণতঃ যে ব্যক্তি বা দল গ্রামের মস্তান/মাতব্বরদের নানা ভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে, তারা হাজার অন্যায় করলেও সহজে পার পেয়ে যায়। কিন্তু যারা তা পারে না তাদের কপালে দুঃখ অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই জোটে না। আগেকার দিনে দুষ্ট জমিদাররা যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাতো এখনও সেই ধরনের অত্যাচার এবং শোষণ এদেশের গ্রামাঞ্চলে বহাল রয়েছে।

শুধু তার বাইরের খোলসটা পাল্টেছে। জমিদারদের জায়গা নিয়েছে মহাজন, সুদখোর, তথাকথিত নেতা, আঞ্চলিক মাতব্বররা। এরা যে-কোনও বিকল্প শক্তি ও সংগঠনকে ভয় করে। তারা চায় না এইসব এলাকায় বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের সমর্থনে ও একতার জোরে এদের কোনও বিকল্প মজবুত সংগঠন গ্রামে গড়ে উঠুক। কারণ গ্রামে বিকল্প শক্তি থাকলে মাতব্বরদের সম্মানের হানি ও আর্থিক ক্ষতিও হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সব থেকে বড় কথা তারা ভাবে কারুর কোন আধিপত্য বা নেতাগিরি গ্রামে থাকবে না।

এদের চরিত্র অদ্ভুত ধরনের। এরা সব সময় গরীব সম্প্রদায়ের উপরই আক্রমণ চালিয়ে সমাজের সমস্ত সুখগুলি ভোগ করতে চায়। সমস্ত ব্যাপারেই এরা আগেভাগে এগিয়ে এসে নিজেদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে কিনা পরখ করে নেয়। যদি কিছু পাওয়ার না থাকে, তবে আজেবাজে মন্তব্য করে সমস্ত ভাল ব্যাপারটাকে গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা করবে। গ্রামগুলি যদি আদিবাসী অধ্যুষিত হয় এবং সেখানে যদি ভিন্ন জাতির চালাক বা মাতব্বর গোছের কিছু লোক থাকে তবে তারা ঐসব সরল, অসহায়, আদিবাসীদের ঠকিয়ে

নিজেদের কাজ হাসিল করে নেয়। আদিবাসী এলাকাগুলিতে এদের প্রভাব সাংঘাতিক। এরা সাদাসিধে সরল আদিবাসীদের জমিজমা আত্মসাৎ করে, ওদের তাড়ি হাড়িয়াতে বেওয়ারিশ ভাগ বসায়, ভয় দেখিয়ে চাকরের মত খাটিয়ে নেয়, আদিবাসী মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে—এক কথায় যা খুশি তাই করে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সমস্ত চরিত্রের মাতব্বররা গরীবদের উন্নয়নে যে যে সংস্থা কাজ করতে এগিয়ে আসে তাদেব কাজ কর্মে প্রচণ্ড বিরোধিতা শুরু করবেই। এই ভাবে বহু জায়গায় প্রভাবশালী মস্তান/মাতব্ববদের প্রচণ্ড বিরোধিতার ফলেই উন্নয়ন কাজ শুরু করা যায়নি।

আমাদের দেশে আবহমানকাল ধরে দালালশ্রেণীর মহাজনদের একটা পুরনো দৌরাত্ম্য রয়ে গেছে। এই দালাল শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা উৎপাদনের কোন কাজে হাত লাগায় না। তারা শুধুমাত্র কাগুজে নোটের জোরে সবচেয়ে বেশী কর্তৃত্ব করে থাকে। ফলে সমাজে যারা উৎপাদন করছে তাদের ঘর শূন্য আর যারা কোন রকম উৎপাদন করছে না— তাদের ঘর সম্পদে ভর্তি।

কেন এমন হচ্ছে? কাবণ দেশেব প্রশাসন ও আইন ব্যবস্থাকে কলা দেখিয়ে এরাই গ্রাম সমাজকে পরিচালিত করছে। এরা গরীব মানুষদের সময়ে অসময়ে জমির বিনিময়ে দাদন বা ধার দেয় এবং পরে তা থেকে দুগুণ তিনগুণ হারে সুদ নিয়ে থাকে। বেশিরভাগ গরীব মানুষ অভাবের তাড়নায় পরে ঐসব বন্ধকী বা গচ্ছিত রাখা জিনিষ আর ফেরত নিতে পারে না। এমনি করেই তারা শেষ সম্বলটুকু হারায়। শেষ পর্যন্ত সে একজন ভূমিহীন চাষী হয়ে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়। একই পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র চাষী, প্রথমে প্রান্তিক চাষীতে, পরে ক্রমশঃ ভূমিহীন ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়ে থাকে। গ্রামে সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে যে, বেশির ভাগ কৃষকই বলবে বর্তমানে তার যে খারাপ অবস্থা আগে তা ছিল না। নিদারুণ অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়েই তারা সর্বহারা হয়েছে। কৃষক সমাজজীবনে বাধ্য হয়ে চাষাবাদ ছাড়াও বিভিন্ন

উৎসব, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা ইত্যাদিতে সপরিবারে অংশ নেয়। লোক লৌকিকতা করতে হয়। এসব করতে গেলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তার চটপট যোগান গ্রামে একমাত্র মহাজনই তাকে দিতে পারে। মহাজন যে তাকে শোষণ করছে তা বুঝতে পারলেও কৃষক জানে মহাজনই তার বিপদের বন্ধু। তাই বেশি সুদ চাইলেও কৃষক মহাজনের কাছেই নিরুপায় হয়ে প্রথম ছুটে যায়। এই সুযোগটা মহাজন পুরোপুরি কাজে লাগায়। বেশিরভাগ গ্রামেই মহাজন ছাড়া চাষীর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। সরকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক/সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণের টাকা যে-সব সর্তে যোগাড় করতে হয়--দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সে-সব শর্ত পূরণ করা দুরুহ ব্যাপার।

তারা জটিল এবং গোলমেলে ব্যাপারের মধ্যে সহজে যেতে চায়না। কৃষকদের কাছে সময়টাও বড় ব্যাপার। বিপদ তো আর বলে কয়ে আসে না। হঠাৎ কোন বিপদ হলে ব্যাঙ্ক বা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান সঙ্গে সঙ্গে তাকে টাকা পয়সা দেবেনা। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নানা রকম নিয়ম কানুনের বেড়াজাল রয়েছে। কিন্তু মহাজনের বেলায় সবকিছু চট্‌পট্, সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। সামান্য মৌখিক কথাবার্তা বা লেখাপড়া। কেবল টাকার সুদটুকুই যা বেশি লাগবে।

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী সুসংহত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প গড়ার জন্য গ্রামে গ্রামে বহু ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে। কাজের চাপ বাড়বে বলে শহরেই নতুন কোন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্ট খুলতে উৎসাহ দেখান না ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা। অকারণ নিয়ম কানুনের জটিল অসুবিধা দেখিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্কে অ্যাকাউণ্ট খুলতে নিরুৎসাহ করে থাকেন। এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। এই যদি শহরের হাল হয় তাহলে গ্রামের অবস্থা কি! এ রকম পরিস্থিতিতে গ্রাম সমাজের চিরন্তন ব্যাঙ্ক বলে স্বীকৃত মহাজনদের ঘরই কৃষকদের কাছে শ্রেয়। এভাবেই মহাজনদের ভূমিকা বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। এরা সংখ্যায় অল্প হলেও এদের দাপট ও শক্তি ক্রমবর্ধমান। তাই স্বাভাবিক

কারণে গ্রামের চাষীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে সংস্থা কল্যাণমূলক কাজ করবে, মহাজনরা তাদের কাজকর্মে বাধা দেবেই। গ্রামে দীর্ঘ দিনের শোষণভরা লেনদেন পদ্ধতিতে কেউ কোন বিকল্প ব্যবস্থা চালু করলে মহাজনরা বাঘের মত গর্জন করে ওঠে। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে গ্রামের মহাজনদের সরকারী আইনে নিয়ন্ত্রণে বাঁধতে না পারলে গ্রামে শোষণ বাড়বে বই কমবে না।

পরিসংখ্যান ঘেঁটেই দেখুন না, দেশে গত বছরে যদি ৪০ লক্ষ কৃষি মজুর থাকে তবে পরের বছর তা বেড়ে ৫০/৬০ লক্ষ দাঁড়িয়েছে। এর একটাই কারণ, সমাজে শোষণ নীতি যেমন ছিল তেমনই আছে বা আরও বেড়েছে।

উৎপাদন বাড়লেও কেবলমাত্র সুষ্ঠ বণ্টনের অভাবে ও চতুর ব্যবসায়ীদের প্যাঁচে পড়ে গরীবরা শোষিত হয়েই চলেছে। সরকারী আইন কানুনের দাওয়াই যত কঠিনই হোক, পরিচালন ব্যবস্থা বাস্তবমুখী না হলে 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেড়ো' হতে বাধ্য। সেইজন্যই হাহাকার, অসন্তোষ, মারামারি, চুরি, ডাকাতি দিন দিন বাড়ছে। এদেশে একটা প্রবাদবাক্য আছে—'পোকামাকড় নয়, চাষীদের বড় শত্রু মানুষ।' তথা-কথিত এইসব রক্তমাংসের মানুষ মহাজন 'আখ্যা নিয়ে গ্রামে বসবাস করছে। উৎপাদিত ফসল ক্রয়-বিক্রয়ের মুখ্য পথে এরা যতদিন থাকবে ততদিন গ্রামের গরীব মানুষ শোষণের হাত থেকে মুক্ত হবে না। গ্রাম-উন্নয়নও যথাযথ হবে না।

গরীবের স্বার্থ রক্ষা করতে বিকল্প কি কি উপায় বার করা যায় তা নিয়ে সরকারী বেসরকারী দুই স্তরেই ভাবতে হবে। চাষীরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল—ধান, গম, সরষে, পাট ইত্যাদির নায্য মূল্য পায় এবং তারা যাতে সরাসরি (কোন দালাল ছাড়াই) সে সব বেচাকেনা করতে পারে সে দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার দরকার আছে।

আজকাল রাজনীতিও গ্রামমুখী হয়েছে। দেশের প্রতিটি ছোট বড় রাজনৈতিক দল স্বাভাবিক কারণেই চায় গ্রামে তাদের দলের আধিপত্য

ও জনপ্রিয়তা বজায় থাকুক। ফলে কোন স্বেচ্ছাসমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গ্রামে কাজ শুরু করলে রাজনৈতিক দলগুলি তাদেরকেও নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করতেই পারে। মতে, পথে বা কাজের ক্ষেত্রে মিল না হলে কারণে-অকারণে এরাও সংস্থার সাথে সংঘাত বাধাতে দ্বিধা করবে না। এবং এইসব ঝামেলায় মাঝখান থেকে গ্রামের মানুষের উন্নয়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

গ্রামে কোন সমাজসেবী সংগঠন দানা বেঁধে উঠলে প্রথমেই রাজ-নৈতিক দলগুলি তাকে স্বমতে আনার চেষ্টা করে। যদি তাদের ইচ্ছা পূরণ না হয় দলগুলি তাদের ক্ষমতায় বাধা আসছে ভেবে বিরোধিতা শুরু করতে পারে। এইসব কারণেই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গ্রামে কাজ শুরু করার আগে গ্রামের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমর্থকদের সকলকে ডেকে গ্রাম উন্নয়নের ব্যাপারটা পরিস্কার বুঝিয়ে শুধুমাত্র উন্নয়ন কাজেই তাদের সহযোগিতা কামনা করে কাজ শুরু করতে পারে। উন্নয়ন কাজে ব্যক্তির একাধিপত্য ও দলগুলির উর্দ্ধে থেকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজ করা দরকার। এ রকম সহজ বোঝাপড়া ও সমঝোতা এলে তবেই কাজ শুরু করা যাবে। নচেৎ কিছু না করাই ভাল। সব দলের নেতারাই মুখে বলেন গরীবের উন্নয়নের জন্যই তার দল কাজ করতে চায়। যদি সে রকম মনোভাবাপন্ন নেতা গ্রামে সত্যিই থাকেন তবে তারা উন্নয়ন কাজে সংস্থার সাথে সহযোগিতা করবেন এটাই স্বাভাবিক ভাবে আশা করা যায়।

সব বিরোধিতার বড় বিরোধিতা হল নিজের লোকদের বিরোধিতা। একে বিরোধিতা না বলে বিশ্বাসঘাতকতা বলাই ভাল। অতীতে অনেক ভাল যোগ্য সুন্দর প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে শুধু নিজেদের মানুষের বিরোধিতায়। এই বিরোধিতার প্রকারভেদ বিভিন্ন রকম হতে পারে। অনেক ব্যক্তি আছে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুঁচ হয়ে ঢুকে সব কিছু জেনে নেয়। তারপর নিজের স্বার্থের জন্য সংস্থায় বিরোধিতার বীজ বপন করে। এক কথায় প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে সর্বনাশ ডেকে আনে। এতে গ্রাম

উন্নয়নের কাজ মুখ থুবড়ে পড়ে। এরা দীর্ঘদিন বন্ধুভাবে থেকে শেষে আঘাত হানে। বদনামও রটায়। এই ভাবেই ভারতের অনেক বড় বড় সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি টুকরো টুকরো হয়ে নিজেদের সংগঠন-ক্ষমতাকে দুর্বল করেছে।

যে কোনও বাইরের শত্রু যত না প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করে ভেতরের শত্রু তার দ্বিগুণ ক্ষতি সাধন করে। তাই সব প্রতিষ্ঠানেই আগে নিজেদের লোকের মধ্যে পরিস্কার একটা বোঝাপড়া থাকা দরকার। নিজেদের লোক যাতে কোন দিক থেকেই সংগঠনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সকলকেই প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। সংগঠনের ক্ষতি যারা করবে তাদের একেবারেই সংস্থায় রাখা চলবে না। ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র করার চেয়ে সামনাসামনি তর্কাতর্কি বা ঝগড়া করা অনেক ভাল। প্রতিষ্ঠানের উপর যাদের মমত্ববোধ, আদর্শবোধ, ভালবাসা, আন্তরিকতা নেই তারা নিজেদের স্বার্থে ঘা লাগলেই আঘাত হানতে কসুর করবে না। সাধারণতঃ নিজেদের লোক টাকা পয়সা, দম্ভ, আক্রোশ, ঈর্ষা, লোভ, অহংকার, ক্ষমতার দম্ভ ও অক্ষমতার জন্যই একে অপরের বিরোধিতা শুরু করে। অনেকে আবার মিলে মিশে কাজ করতে না পারার জন্যই বিরোধিতা শুরু করে দেয়। সুতরাং নিজের লোকের সঙ্গেও চলাফেরা সাবধানে করতে হবে।

সপ্তম পদক্ষেপ ঃ

গ্রামোন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ

গ্রাম উন্নয়নের কাজে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক গুরুত্ব আছে। আমাদের বেশির ভাগ গ্রাম পাশের গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন বা দুর্গম। রাস্তা নেই, সেতু নেই। রাস্তা থাকলেও তা সংকীর্ণ, ভাঙাচোরা, ঝোপঝাড়ে বোঝাই, যান চলাচল ও মানুষের চলাফেরার অযোগ্য। আঁকাবাঁকা অবৈজ্ঞানিক পথ ঘাটের কারণে সদরের সঙ্গে, কাছের শহরের সঙ্গে

যোগাযোগ তো দূরের কথা, অনেক পাশাপাশি দুটি গ্রামের মানুষের সঙ্গেও যোগাযোগ হয় না। বিশেষ করে, বর্ষাকালে গ্রামের রাস্তাঘাটের অবস্থা চরমে পৌঁছায়। রাস্তাঘাট ডুবে যায়। কাদায় ভরে যায়। চলাফেরা করা যায় না। কেউ অসুস্থ হলে চট্ করে ডাক্তার বা ঔষধ পথ্য আনা যায় না।

উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার আগে গ্রামের এই অকেজো রাস্তা-গুলোকে মোটামুটি মেরামত করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ঝকঝকে পাকা রাস্তাঘাট না হলে গ্রামোন্নয়ন অসম্ভব--একথা বলছিনা। তবে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পায়ে হেঁটে বা হাল্কা যানবাহনের চলাচলের জন্য নিদেনপক্ষে মাটিরও একটা উঁচু শক্তপোক্ত রাস্তার দরকার আছে। প্রয়োজনে যেন সাইকেল, গরুর গাড়ি, জীপ্ ইত্যাদি ঐ রাস্তায় চলতে পারে। রাস্তাঘাট ভাল না হলে গ্রামের উৎপন্ন পণ্য শহরে নিয়ে যাওয়াও যাবে না। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যও হবে না। গ্রামের মানুষরা তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্যও পাবে না। সুতরাং গ্রামের উন্নতির স্বার্থেই গ্রামের রাস্তা মেরামতির জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়ার দরকার আছে। যদিও রাস্তা সংস্কারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে ফেরৎযোগ্য কিছুই অর্থ আসবে না। তথাপি অন্যান্য প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ থেকে পরোক্ষে গ্রামোন্নয়নের বহুবিধ সুযোগ সুবিধে পেতে হলে গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তা ঘাট মেরামত করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সবই গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খুবই দরকার। অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং দূরবর্ত্তী এলাকার সঙ্গে গ্রামের দ্রুত যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমগুলি গ্রাম উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত ও সহজ করবেই।

গ্রাম সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা খুবই আবছা বা পুঁথিগত, তাঁরা সর্বদা ধরেই নেন গ্রাম মানেই অশিক্ষা, বনজঙ্গল, অন্ধকার, কুসংস্কারে আবদ্ধ নির্জন এক এলাকা। সেখানে কোন উৎসাহ, আনন্দ, উদ্দীপনা কিছু নেই। শুধু অলসভাবে দারিদ্রকে সাথী করে দিন যাপনের গ্লানি। বাইরে

থেকে এরকম মানসিকতা নিয়ে কোন মানুষ গ্রামে কষ্ট করে পৌঁছলেও দুই একদিনের মধ্যেই সে হাঁপিয়ে উঠে। সব ভারতীয় গ্রামের চেহারা-চরিত্র এমন নয়। তবুও মানুষ সেখানে সহজভাবে যাতায়াত করতে পারে না।

গ্রামের প্রকৃতি নয়ন সুখকর। কিন্তু সকলের চোখে সেই সৌন্দর্য্য না-ও ধরা পড়তে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বাকী সুযোগ সুবিধেগুলি থাকলে তবেই তা মানুষকে টানবে যা শেষ পর্যন্ত গ্রামের মানুষের সঙ্গে একটা আদান প্রদান গড়ে তোলে, মানসিক যোগাযোগের সেতুটা মজবুত হয়। ফলে মানুষের সাথে মানুষের,গ্রামের সাথে শহরের দূরত্ব কমে আসে। একেই তো অনুন্নত এলাকার মানুষ একটু-আধটু হীনমন্যতায় ভোগে। ওরাও যে জীবনে কিছু করতে পারে সে আত্মবিশ্বাস ওদের মধ্যে নেই বললেই চলে।

জীবনের অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ বাদ দিয়ে ঐ সব দরিদ্র গ্রামবাসীরা কোন রকমে দিন আনে দিন খায়। ঐ সবই ঘটে থাকে কিন্তু প্রকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে। এলাকাগত যোগাযোগই শেষ পর্যন্ত আর্থিক বা মানবিক যোগাযোগের প্রধান উপাদান ও সহায় হয়ে ওঠে।

অষ্টম পদক্ষেপ ঃ

গ্রামোন্নয়নে ব্যাঙ্কের ভূমিকা ও গুরুত্ব ঃ

যে কোনও ধরনের উন্নয়ন কাজের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গ্রাম উন্নয়নের কাজেও ব্যাঙ্কের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বর্ত্তমানে যদিও দেখা যাচ্ছে যে কৃষক ও ব্যাঙ্ক কর্মীদের যৌথ বোঝাপড়ার অভাবে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নে আশানুরূপ হচ্ছে না। ব্যাঙ্ক দরিদ্র কৃষকদের কাছে লগ্নী করতে সাহস পায় না।

একমাত্র যাদের বেশ কিছুটা স্থাবর সম্পত্তি আছে এবং ঋণ ফেরৎ দেবার ক্ষমতাও আছে, তারাই ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভের কাছ থেকে বেশির ভাগ সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকে। বাস্তবে দেখা গেছে এরাই কিন্তু ঋণ পরিশোধ করে কম। প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্কের লগ্নীর টাকা প্রান্তিক চাষী, ও কৃষি মজুরদের ভাগ্যে সামান্যই জোটে। যদিও সরকারী মহল এদেরকে, গ্রামের দরিদ্র মানুষদের ঢালাও ভাবে ঋণ দেবার জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এই সমস্ত দরিদ্র শ্রেণীর কৃষি মজুরেরা ঋণ পায় না, তার মূল কারণ এঁরা বেশির ভাগ সময়েই অসংগঠিত, নিরক্ষর ধরনের মানুষ। নিজেদের বক্তব্য সঠিক ভাবে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির কাছে বলতে পারে না। দৌড় ঝাঁপও করতে পারে না। ব্যাঙ্ক ধরেই নেয় টাকা নিয়ে ঠিক মত হয়তো খাটাতে পারবে না। ঋণের টাকা ফেরতও দিতে পারবে না—ইত্যাদি। এই রকম অবস্থায় এই সব গরীব মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে কোন গ্রামীণ সংগঠনও বড় একটা এগিয়ে আসে না। এলেও তাদের দাবী-দাওয়া মেটাতে গিয়ে গ্রামের গরীব মানুষ ক্লান্ত ও ফতুর হয়ে যায়। উপযুক্ত জামিনদারের অভাবে ব্যাঙ্ক এদেরকে টাকা লগ্নী করতে ভয় পায়। এর ফলে বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে গ্রামের গরীব চাষীর মুখ্যত বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক-সেতু গড়ে ওঠে না। ব্যাঙ্কের লগ্নীকরণে আজকাল এত বেশী আইন কানুনের ঝামেলা যে কৃষকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে বিরক্ত বোধ করে। তারা ব্যাঙ্কের থেকে পুরনো পরিচিত মহাজনকেই বেশি সুদ দিতে হলেও অধিক পছন্দ করে। কারণ মহাজন কৃষকের পাশে পাশে থাকে। ফলে কৃষকরা ব্যাঙ্কের থেকে মহাজনকেই লগ্নীকারক হিসাবে আগে বেছে নেয়। মহাজন আর যাই করুক নিজের ব্যবসা ঠিক রাখে। তার ব্যবহারও মধুর। মহাজন মুখের কথায়, বিশ্বাসে বা সামান্য কিছু বন্ধক রেখে প্রয়োজনীয় টাকা চাষীকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেয়।

চাষীরা ব্যাঙ্কের জটিল কাগজ-পত্রকে ভয় করে। ঘর-গেরস্থালির,

জমির হিসাব, সই, সাবুদ, পাশপোর্ট ফটো, হেনতেন করতে গিয়ে তারা হাঁপিয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় এতসব করেও শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের টাকা পেতে চাষীর চাষবাসের মরশুম চলে যায়। ফলে এত হাঙ্গামা, হুজ্জুতির পর ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া দরকারী টাকাটা চাষীর কাজেই লাগে না। ফলে ব্যাঙ্ক চাষীর সহায়ক না হয়ে উল্টে তার বিড়ম্বনার কারণই হয়ে ওঠে।

চাষীরা ব্যাঙ্ককে হাতের কাছেও পায় না। বেশীরভাগ ব্যাঙ্ক জেলার সদরে বা শহরাঞ্চলেই স্থাপিত হয়। ফলে চাষীর যাতায়াতের খরচ, যোগাযোগের সমস্যাও আছে। আজকাল অবশ্য দূরবর্তী গ্রামের মধ্যেই ব্যাঙ্ক প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এটা শুভ লক্ষণ। কেবল ঋণ নেবার সময়ই কৃষকদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অফিসার ও কর্মচারীদের যোগাযোগ ঘটে। এছাড়া সামাজিকভাবে গ্রামে তথাকথিত 'অশিক্ষিত' চাষীদের সঙ্গে 'শিক্ষিতবাবু' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের যোগাযোগ ঘটে নামমাত্র। কেবলমাত্র ঋণ আদায়ের সময়েই ব্যাঙ্কের কর্মিরা কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অথচ কৃষকরা সঠিক মত সেই ঋণের টাকা ব্যবহার করছে কিনা ব্যাঙ্কের তরফ থেকে তা দেখা হয় না বললেই হয়। মনে হয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি করে "Rural Field Service Unit"-বা আঞ্চলিক 'পল্লীসেবা কেন্দ্র' থাকা দরকার। ঐ ইউনিটের কাজ হবে ঘুরে ঘুরে চাষীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের জন্য ছোট ছোট প্রকল্প তৈরী করে গ্রাম কমিটির মাধ্যমে টাকা লগ্নী করার ব্যবস্থা করা। তাহলে ব্যাঙ্কের টাকা যথাযথ ব্যবহার হবে এবং সে টাকা ফেরৎও হবে।

এই কাজে যে অফিসার বা ইউনিট সাফল্য দেখাতে পারবে ব্যাঙ্ক তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করলে কাজের উৎসাহ আরও বাড়বে।

ব্যাঙ্ককে ভাবতে হবে শুধু টাকা দাদন দিলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। দেখতে হবে টাকাটা কৃষকেরা যে কাজের জন্য নিচ্ছে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা, যা টাকা দেওয়া হচ্ছে তা যথেষ্ট কিনা। তাছাড়া টাকা ঠিক সময়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। এবং কৃষকরা সংগঠিত-

ভাবে চাষবাসের কাজ করতে পারছে কিনা তাও দেখা দরকার। বিশেষ করে গরীব নিরক্ষর মানুষের হাতে নগদ টাকা এলেই তার ভেবে কুলকিনারা পায় না 'কিভাবে টাকাটা খরচ করবে' বা নিজের প্রয়োজনে লাগাবে। দালাল এই সময় তাদেরকে ঠকাতেও চেষ্টা করে। তাছাড়া নেশা, জুয়া ও অন্যান্য নানান ব্যাপারেও ঐ কাঁচা টাকা নষ্ট হতে পারে। ব্যাঙ্কের সূত্র ধরেই কো-অপারেটিভ বা সমবায় ব্যাঙ্কের ভূমিকা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। গ্রামে গ্রামে সমবায় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট গড়ে উঠলেও তাদের কাজকর্ম বেশীরভাগ গ্রামবাসীদের প্রাণে সাড়া জাগাতে পারে নি। কারণ প্রথম দিকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে ব্যাপারটা শুরু হলেও ঋণ দেওয়া-নেওয়া ব্যাপারে ঐ ধরনের সংস্থাগুলি ঋণের বোঝা সামলাতে না পেরে শেষমেষ বন্ধ হবার উপক্রম হয়। এখানেও সেই শক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর অভাব। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মুখ্য ভূমিকা বা উদ্দেশ্য কি তা অধিকাংশ কৃষকই জানে না। তারা বোঝে সমবায় সমিতি দরকারমত টাকা দেবার একটা অফিসমাত্র। তাছাড়া গ্রামীণ সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে গ্রামের মাতব্বরশ্রেণীর মানুষই বেশী থাকে। তারাই সাধারণতঃ মোটা টাকার ঋণ নেয় এবং প্রায়ই তা ফেরৎ দেবার প্রয়োজন বোধ করে না।

একটি ব্যাঙ্কের জনৈক ফিল্ড অফিসার একবার বলেছিলেন "প্রান্তিক কৃষকদের নিয়ে ঝামেলা কম, তাদের ঋণের বোঝা কম, ঋণের টাকা ফেরৎ দিতেও তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু বড় বড় জোতদাররা নিজেরা টাকা ফেরৎ দেয় না, অন্যান্যদেরও ঋণ পরিশোধ করতে বারণ করে।"

গ্রামীণ সমবায় সমিতিতে স্বজন-পোষণ নীতিও প্রবল। পরিচিত লোকেরা বেশি ঋণ পায়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মর্জিমত অনেকে ঋণ পায়। এইভাবে লিখিত আইনকানুনের বাইরে সমিতি চলতে গিয়ে নানা দুর্নীতিতে বন্ধ হয়ে গেছে।

এদের ঋণ আদায়ের কৌশলও মাঝে মধ্যে চূড়ান্ত অমানবিকতার রূপ নিয়ে থাকে। সুপারভাইজারকে সঙ্গে নিয়ে জীপ ছুটিয়ে চাষীর বাড়ী

হানা দিয়ে ঋণ সংগ্রহ করতে না পারলে তার হালের বলদ, ধান, চাল, সব ক্রোক করে। এমনকি ঘরের টিনের চাল পর্য্যন্ত খুলে নেয়। এর ফলাফল হয়েছে কোন কোন গ্রামে মারাত্মক মারামারি লাঠালাঠি, সুপারভাইজার অপমানিত, অপদস্থ হয়েছেন। এইভাবে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে সমবায় সমিতির সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হয়েছে। আন্তরিকতা, ভালবাসা, সুসম্পর্ক নষ্ট হয়েছে। অনেক কৃষককে দেখেছি তারা সমবায় সমিতির নাম পর্যন্ত করে না। অবশ্য সব জায়গাতেই-কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এক অবস্থা নয়। কোন কোন জায়গায় যোগ্য পরিচালনার জন্য সোসাইটির কাজ প্রশংসিতও হয়েছে।

যাই হোক, এইসব সমস্যার সমাধান করে গ্রামের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে সঞ্জীবিত করা উচিৎ। সাধারণ কৃষকদেরও সোসাইটির রীতিনীতি এবং সেবামূলক কাজগুলিতে সামিল করা দরকার। সাধারণ কৃষক যেন এর মূল্য বুঝতে পারে। তারা নিজেদের বাঁচার স্বার্থে একে বাঁচিয়ে রাখবে, এ রকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে গড়ে তোলা উচিৎ। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এর মধ্যে গরীব কৃষকদের প্রতিনিধি বাধ্যতামুলকভাবে রাখা দরকার। আসলে গ্রামের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও ব্যাঙ্ক দুজনকেই কাজে লাগাতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষদের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ও কো-অপারেটিভের ক্ষমতাকে তাদের নিজেদের তথা গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে কাজে লাগাতে শিখতেই হবে।

নবম পদক্ষেপ ঃ

আধুনিক সভ্যতা, গ্রামীণ মানুষ ও গ্রামোন্নয়ন ঃ

সব সময় সব জায়গায় একটা মস্তবড় প্রশ্ন থাকে—আমাদের জীবনকে আমরা কেমনভাবে গড়বো? কেমনভাবে জীবনটাকে পরিচালিত করবো। পরিমিতিবোধ থাকবে কতটা? ভাল জীবন গড়তে হলে

ভাল জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব শিক্ষা, পরিবেশ, ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারার উপরেই তা গড়ে ওঠে। যেহেতু মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, তাই আমাদের জানতে হবে, কতটা জিনিস হলে আমরা সন্তুষ্ট হবো। আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারব কিনা! ক্রমশঃ আকাঙ্ক্ষা বাড়বে কিনা? কিভাবে গড়ে উঠবে আমাদের আত্মিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইত্যাদি।

জীবনধারণের জন্য মানুষের যতটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তার জন্য যে ইচ্ছা, যে শ্রম, যে সফলতা বা বিফলতা তারও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকতে হবে। একই মানুষ একসঙ্গে দশটা জামা গায়ে দিতে পারে না বা একই সঙ্গে পাঁচটি বাড়িতে থাকতে পারে না। প্রয়োজন তার একটিমাত্র ঘরের। প্রয়োজন তার কম করে দুটি জামা। সেখানে বেশীটুকুর যে দাবী বা আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে তা দেশের পক্ষে, সমষ্টির পক্ষে, এমন কি নিজের পক্ষেও কখনই মঙ্গলজনক নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস মজুত করলে বাজারে যোগান কমবে। ফলে জিনিসের দাম বাড়বে। এতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ কিছু নেই। লক্ষ্য করার বিষয় শহুরে জীবনে কেবল অনাবশ্যক বিলাসিতার চাহিদা—যার দুটো করে কাপড় আছে দেখা যাবে তিনি সারা বছরে কেবল কাপড়ই কিনে চলেছেন। তিনি সময়ই পেলেন না সবকটি কাপড় পড়ার। এইভাবে ক্রয়ক্ষমতা যার বাড়ছে তিনি অর্থের বিনিময়ে ক্রমাগত ভোগ সামগ্রী বাড়িয়ে চলেছেন। তার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আজকাল সব দিকে এই এক অদ্ভুত কৃত্রিমতা ও Status এর দৌড় প্রতিযোগিতা চলেছে। কে কত বেশী আধুনিক হতে পারে. কে কত দুহাতে টাকা ওড়াতে পারে। তাদের ভাবনা কিভাবে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত করবে। অর্থকেই জীবনসর্বস্ব করে তারা মানুষের সঙ্গ ছেড়ে বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদে 'নিজেদের আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই সব ঘটনা শহুরে সমাজ জীবনেই বেশি দেখা যায়। কোন সংযম বা পরিমিতিবোধ নেই। এদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই যেন—(১) আরও

বেশি টাকা রোজগার করা, (২) চরমভাবে তা ভোগ করা ও প্রচুর অপচয় করা।

উচ্চমধ্যবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের এই জীবনদর্শন ও সভ্যতা আজ সর্বব্যাপী। শহরের বাজারদরকে এরাই গরম করে রেখেছে। দিনকে দিন তা বাড়িয়ে তুলছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও এদের কেনাকাটার কোন ঘাটতি দেখা যায় না। পাঁচজনে যাতে তার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, "কিনলো বটে দেখলুম বাবা—এসব কি আমরা পারব?" এই ধরনের কথাবার্তা। এইসব শুনে এই ধরনের ক্রেতারা আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। ভাবেন জীবনে এর চেয়ে সম্মান আবার কি? আমি যা পাচ্ছি অন্যে তা পাচ্ছে না। বরং আফসোষ করছে। অন্যরা যারা ঐ দৃশ্য দেখছে তারা ভাবছে 'এটাই হল সবচেয়ে বড় ফ্যাসান বড় সম্মান, বড় সভ্যতা।' সুতরাং ঐ লক্ষ্যে যেতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। ফলে সবাই পেটফোলা ব্যাগের মত আরও বিলাসী আরও ধনী হতে চাইছে। ভোগ বিলাসের উচ্চাশা এদের জীবনের মূলমন্ত্র।

একদিকে সমাজের এই মেকী সভ্যতার ছবি—অর্থাৎ অর্থের প্রাচুর্য, ভোগবিলাস, লালসা, অপচয়—অন্যদিকে অন্ধকার গ্রামের সর্বহারা মানুষের দৈনন্দিন দারিদ্র্য। গ্রামের এইসব দরিদ্র মানুষরা শহরের আজব মানুষগুলোর দিকে চেয়ে ভাবছে—'এভাবেই বুঝি মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়।' জীবনযাপনের এই মারাত্মক প্রভাব গ্রামবাসী-দেরও অস্থির করে তোলে। তারাও শহরকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে। যথেষ্ট অপমান ও কষ্ট পেলেও সে অনুকরণে তাদের ছেদ পড়ে না। ক্রমশঃ তারা নিজেদের গ্রামকে অশ্রদ্ধা করতেও শেখে। গেঁয়ো বলে পাছে কেউ টিটকারি দেয় তাই লজ্জায় নিজেদের গ্রামের নাম পর্যন্ত বলে না।

দুর্বল মানসিকতায় তাদের বুক কাঁপে। তবু আশা ছাড়ে না। ঐ তৈলাক্ত বাঁশের উপরের ভোগবাদী সভ্যতাই তাদের হাতছানি দেয়।

এভাবেই দলে দলে বহু গ্রামের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা গ্রামকে গ্রাম নিঃস্ব করে শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

আলোর ঐ রোশনাই-এর কাছে তারা পতঙ্গের মত ঝরে যায়। এখানেই সেই চাওয়া পাওয়ার, তীব্র সংগ্রাম। আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির সংগ্রাম। এ সংগ্রামে শহরেরই জয় হয়েছে চিরকাল। সর্ব অর্থে গ্রামকে শুষে শহর ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু শহরকে অনুকরণ করে গ্রামের উন্নয়নপরিকল্পনা নেওয়া যায় না। প্রয়োজনবোধ, পরিমিতিবোধের শিক্ষা গ্রামে বসে— গ্রামের মানুষের যোগানের উপরই তৈরী করতে হবে। একটি পরিবারের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু অর্থ, সম্পদ, ভাত, কাপড়, কাজ ও আশ্রয়ের প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই থাকতে হবে। এটাই জাতির প্রথম পরিকল্পনা হওয়া উচিত। বেঁচে থাকার জন্য দেশের সব নাগরিক ওগুলো পেলে তবেই সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক। ব্যাপক বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক সামাজিক কর্মসূচীই এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকেও কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশে এসব যে একেবারেই কিছু হচ্ছে না তা নয়। তবে সবই ভাসা ভাসা। সমষ্টির নামে মুষ্টিমেয় চালাক মানুষ এসব ভোগ করছে। তারা বা তাদের লোকরাই যাবতীয় কর্তৃত্ব করছে। এরা সমাজের ২০ ভাগ মানুষের দল, বাকি ৮০ ভাগ সেই হাহাকারের দলে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল এঁরা হলেন গ্রামের মানুষ। স্বাধীনতার ৪২ বছর পর আজও যদি এই দেশের মানুষ বলে—'একটু ফ্যান পাবো? কতদিন খাওয়া হয়নি, কাজ পাচ্ছি না....থাকার জায়গা নেই....শীতে বর্ষায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। জামা নেই।' এ যে কত লজ্জার, কত দুঃখের তা ভাবা যায় না!

যারা এইভাবে নানা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে তারা কথায় কথায় হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছে। পাঁচতারা হোটেলে পার্টি দিচ্ছে। 'এটা নিয়ে আমার ৫০টা জামা কাপড়ের সেট হল। জানো ভাই, আমার অ্যালসি-সিয়ানটার দুদিন যাবৎ খুব অসুখ, একদম খাচ্ছে না। ছেলেটা আমেরিকায়

Settle করেছে। মেয়ে জামাইও কানাডায়।' সম্পর্কহীন, দেশজ, শিকড়হীন এইসব মানুষদের গর্বভরা কথার দাপটে, হট্টগোলে সাধারণ মানুষ তথা গ্রামের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, কথাবার্তা, সমস্যা সব চাপা পড়ে আছে, এবং যাচ্ছে। আজ গ্রামের মানুষেরও তাই জীবনযাত্রা ও ভোগবাদের ধারণা পাল্টাতে হবে। তারা নিজেরাই আলোচনা করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে পাল্টাবে। তাদের স্বার্থে যা কুলায়, তাদের প্রয়োজনে যা লাগে সেটুকুই নির্দিষ্ট করে পরিমিতটাই ভোগ করতে হবে। অমুকে ১ কেজি মাংস খেয়েছে বলে আমাকেও ২ কেজি মাংস খেতে হবে তা নয়। সাধ্যে যা কুলায়, প্রয়োজনবোধে সেইভাবেই চলা উচিৎ। মনে রাখতে হবে অপচয় না করা মানে সঞ্চয় করা এবং সঞ্চয় করা মানেই সম্পদ আয় করা। সম্পদ মজুত থাকলে দুঃখের দিনগুলো উৎরে যায়। অথচ বেহিসেবী চলা মানেই অপচয় করা। দুঃখের গাড্ডায় পড়া। এসব ভাবনা জাগ্রত চেতনার উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত শিক্ষা-বোধ বা সামাজিক সচেতনতাবোধ না জাগলে এসব ভাবনা আসবে না। গ্রামেব সম্পদ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন প্রয়োজন ও পরিমিতি-বোধকেও শিক্ষিত ও উন্নত করতে হবে। আয় বাড়লেই যে দুঃখ ঘোচে তা নয়। সংসারে সুখই দুঃখের পাল্লাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আয়ের সম্পদ বা জিনিস ব্যবহারের উপরেই সবকিছু নির্ভর করে। পরিমিতিবোধ মেনে চলা মস্ত বড় এক শিল্প। অনেক বেশী আয়ের বা শিক্ষিত পরিবারও এ শিল্প অনুসরণ করতে পারে না। এ এক উপলব্ধি বোধের শিক্ষা। তাছাড়া সময় একটা মস্তবড় ব্যাপার। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে পারলে তা ফলপ্রসূ হয়।

আজকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে অনুন্নত গ্রামের অধিবাসীরা সামাজিক, মানসিক সবদিক থেকেই সর্বহারা। তাই আজ তাদেরকে সম্পদ ভোগ ও সম্পদ সৃষ্টির এবং তা রক্ষার বাস্তবমুখী শিক্ষা নিতে হবে। গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবীদল এ কাজটা হাতে নিতে পারে।

সাধারণতঃ দরিদ্র গ্রামবাসীরা খাদ্য হিসেবে যা খেতে পায় তা

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে অধিকাংশ গ্রামবাসী অপুষ্টিতে ভোগে। তাদের দৈনিক এইসব খাদ্যের মানও খুবই খারাপ। তাতে খাদ্যমূল্য বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। ভাত সেদ্ধ, কাঁচা পেঁয়াজ, বুনো শাক-পাতা, লঙ্কা, বড় জোর আলু পোড়া। পুষ্টি তাতে সামান্যই। এইসব খেয়েই তারা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ভাতই এদের কাছে সব কিছু। যার পুষ্টিমূল্য বলতে (ফেন গালার পর) কিছুই নেই। তাও সবাই যে পাচ্ছে তা নয়। যারা যারা জোটাতে পাচ্ছে, তারাই খাচ্ছে। বেশির ভাগই অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকছে। দুর্বল শরীরে রোগ প্রতিরোধের শক্তি কমছে। ফলে নানা রোগপীড়া তাদের সহজে আক্রমণ করছে। এসব দুর্বল অসহায় মানুষদের সংগঠিত করে তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা ও নতুন সমাজ গঠনের পথে পরিচালিত করা সহজ কাজ নয়। তাদের মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের সঙ্গে থেকে হাতে কলমে কাজ করে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার শিক্ষা দিতে হবে। আগে বলেছি—আবার বলছি—এই অসম্ভব শক্ত কাজটি করার জন্য যোগ্য আন্তরিক দক্ষ কষ্টসহিষ্ণু ত্যাগী মানুষের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সমাজকর্মীদের প্রয়োজন। যেখানে প্রকৃত সমাজ বা গ্রাম উন্নয়নের কাজ হয়েছে—ঐ উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাই তা করেছে। অথচ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাংগঠনিক শক্তি ও আন্তরিকতার অভাবে এ সমস্ত কাজে কোথাও উল্লেখযোগ্য নজির সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও সরকারের অর্থ লোকবল যন্ত্রপাতি কোন কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু কাজের কাজ অর্থাৎ গ্রামের উন্নতি কমই হয়েছে। সেই তুলনায় বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেশি বাধার সম্মুখীন হয়ে সবচেয়ে কম সামর্থ নিয়ে, সবচেয়ে ভাল কাজ করছে। এইজন্য গ্রামের মানুষের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সম্পর্ক যতটা মধুর ও দৃঢ়, সরকারী কর্মিদের সঙ্গে ততটা নয়। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থারা যদি এক্ষেত্রে মিলেমিশে কাজ করে তবে কাজটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের আন্তরিকতা, সহানুভূতি, ভালবাসা,

নিষ্ঠা, বিশ্বাস, তাদের সংস্থার মস্তবড় সম্পদ। তারা সব সময় দেখে গ্রামের মানুষ নিজেদের পায়ে সত্যি করে দাঁড়াতে পারছে কিনা। এর ফলে গ্রামের মানুষেরও তাঁদের উপর বিশ্বাস বেড়ে যায়। তারা সব সময়ই তাদেরকে পাশে পাশে পায়। বুদ্ধি পরামর্শ নেবার সুযোগ পায়। ক্রমশঃ তারাই তাদের কাছে আপনজন হয়ে ওঠে।

দশম পদক্ষেপ ঃ

গ্রাম সংগঠন প্রতিষ্ঠানকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে ঃ

প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। কারুর সাহায্য ব্যতিরেকেই তার যেন এগিয়ে চলার ক্ষমতা থাকে। বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানই পরের আথিক সাহায্যে গড়ে ওঠে। ফলে সংগঠন শক্ত না হলে পরের সাহায্য না এলেই প্রতিষ্ঠান উঠে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। এরকম বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে সকল ক্ষেত্রে মজবুত করার জন্য সংস্থার কর্মকর্তাদের আগে ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবতে হবে। সেভাবেই সকলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ ক্রমশ বিস্তৃত করতে হবে। এই স্বনির্ভর মানসিকতার প্রশিক্ষণ প্রকল্প অফিস থেকে শুরু করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে চাষীর কাজের আরও সুবিধে আনতে হবে। ভাবলে অবাক হতে হয় অন্যান্য দেশের উন্নত কৃষি বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে। অথচ আমরা এখনও সেই মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ও কুসংস্কার নিয়ে কাজকর্ম করছি। এতে যথেষ্ট উৎপাদন বাড়ছে না, অভাবও ঘুচছে না। অথচ লোকসান বেড়েই চলেছে। আধুনিক কৃষিবিদ্যার প্রসারেও চাষীদের জ্ঞান ও আত্ম-নির্ভরশীলতা বাড়বে। আগ্রহও বাড়বে। আধুনিক পদ্ধতিতে যদি কৃষকের উৎপাদন ও আয় বাড়ে তবে সকলেই আগ্রহী হবে ও তা খুশী মনে গ্রহণ করবে। উচ্চফলনশীল ধান অধিক উৎপাদন করে দেখাতে না

পারলে কৃষক তার নিজস্ব ধান ফেলে রেখে উচ্চফলনশীল ধান বুনতে উৎসাহ পাবেনা। যতক্ষণ না সে হাতেনাতে প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে ততক্ষণ আধুনিক কৃষি পদ্ধতিকে সে কিছুতেই গ্রহণ করবে না। যখন দেখা যাবে যে প্রতিটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তার ও সমষ্টির সমস্যার মোকাবিলা করতে পারছে এবং অর্থ নৈতিক সামাজিক উন্নতি ঘটাতে পারছে তখনই বোঝা যাবে আত্মনির্ভরশীল এক সত্যিকার গ্রাম সংগঠন তৈরী হতে পেরেছে। মোদ্দা কথা, নিজের দায়িত্বে নিজের শারীরিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং খাওয়া ও পরার ক্ষমতাটুকু ব্যক্তি ও সংগঠনকে বজায় রাখতে হবে।

একাদশ পদক্ষেপ

সংগঠনের আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে ঃ

আলো আছে বলেই আঁধার আছে, খারাপ আছে বলেই ভালর এত কদর। দোষ আছে বলেই গুণের এত দাম। পৃথিবীর সব কাজেই সু আর কু দুটো দিক বর্তমান আছে এবং থাকবে। সবকিছুকে সঙ্গে নিয়ে উৎরে কে কতটুকু চলতে পারল শেষপর্যন্ত তারই জিৎ হবে।

সব প্রতিষ্ঠানের মত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও দোষমুক্ত নয়। তারও দোষ, ত্রুটি, বিচ্যুতির অভাব নেই। সেগুলির বিষয়েও সচেতন হওয়া দরকার। আত্মসমালোচনা করতে হবে। গ্রাম উন্নয়নের কাজের সঙ্গে যেসব কর্মীরা যুক্ত, কিছুদিন কাজ করার পর তাদের মনে একটা হতাশার ভাব জেগে ওঠে। তারা তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই মনমরা হয়ে পড়ে। বাস্তবিকই ভবিষ্যৎ বলতে তাদের কাছে কিছুই নেই। মোটা মাইনে, পেন্সন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুইটি, চাকুরীতে স্থায়িত্ব বা প্রমোশন কিছুই নেই। অর্থাৎ তাদের অর্থ নৈতিক রোজ-গারের কোন স্থিরতা নেই। এই ভবিষ্যৎ ভাবনাটাই তরুণ কর্মীদের বিচ্ছিন্ন ও হতাশ করে ফেলে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। স্থায়ী

কোন কাজ পেলেই নির্দ্বিধায় প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায়। এভাবে কর্মীরা বিশেষত ভাল, সৎ ও বিশ্বস্ত কর্মীরা চলে গেলে প্রতিষ্ঠানের খুব ক্ষতি হয়। প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট দক্ষ কর্মীর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। যে চলে যায় তার জায়গা সহজে কেউ পূরণ করতে পারে না। তাছাড়া একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সমাজকর্মীকে তৈরী করতে যথেষ্ট কাঠখড়ও পোড়াতে হয়। একেবারে বিনা পয়সার আত্মনিবেদিত, সর্ব-ত্যাগী কর্মীমানুষ পাওয়া গেলেও তা সংখ্যায় খুবই কম। এ ধরনের মানুষ যদিও বা জোটে বেশিরভাগই অতি বৃদ্ধ মানুষ। সাধারণত আশ্রয় ও রোজগারহীন বুড়ো বয়সে এসব উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছে যাদের জাগে, তাদের কেউ কেউ আসলে থাকা খাওয়ার পরিবর্তে বিনে পয়সায় কাজ করতে রাজী হন। তাঁদের দুর্বল সেবায় প্রতিষ্ঠান বড় একটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে তাদের আগমনে প্রতিষ্ঠানের বাস্তবমুখী (Practical) কাজ সম্পন্ন না হয়ে তাত্ত্বিক কাজই বাড়ে। বাস্তবমুখী কাজ তরুণদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া হয় না। তাই তরুণদের প্রতি সকল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নজর দিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যেককে তার কাজের বা পরিশ্রমের যোগ্য সম্মান ও যোগ্য মূল্য দেওয়া উচিত। তার বিপদের সময়ের অসুবিধেগুলি বোঝা উচিত। আজকাল কোন কোন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান এসব করার চেষ্টা করছে। সমাজসেবীদের পেশাদারী পর্যায়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। এগুলি নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ।

এইসব প্রতিষ্ঠানের আর একটা পরিচিত দোষ হল প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ঢিমেতালে চলে। কারণ কর্মীরা যেহেতু সামান্য অর্থ পারি-শ্রমিক হিসেবে পায়। তাই তাদের উপর চাপ সৃষ্টি বা কাজের দায়িত্ব সেভাবে বর্তায় না। কর্মকর্তারা, তাদের নিয়ন্ত্রণেও রাখতে পারেন না। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্রের দুর্বলতাও রয়েছে। এসব প্রতি-ষ্ঠানের হিসাবপত্র প্রায়ই ঠিকমত রাখা হয়না। যোগ্য ও সৎ মানুষ না

থাকলে এসব প্রতিষ্ঠানের হিসাব চালানোও শক্ত। বিশেষ করে এসব প্রতিষ্ঠানে যখন অর্থের সঙ্কুলান কম। উপরন্তু সেই অর্থ যদি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না হয় তবে প্রকল্প তথা সংগঠনকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। সুতরাং প্রথম থেকেই হিসাবপত্রের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।

কাজকর্মে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচুর স্বাধীনতা থাকার ফলে ব্যক্তি প্রাধান্য ও স্বেচ্ছাচারিতাও এসব প্রতিষ্ঠানে আসতে পারে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে উঠলে তা সংগঠনের পক্ষে নানান অসুবিধার সৃষ্টি করে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মনে করে তারাই শুধু দরিদ্রের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য ভাবে, কাজ করে; অন্যেরা কিছুই ভাবে না বা করে না। এভাবে অন্যের সঙ্গে, সহযোগী সংস্থার সাথে সহযোগিতার সেতু নষ্ট হয়। একাজে ভালবাসাই চরম কথা। ভালবাসার মাধ্যমে সব কাজ করতে হবে। সব শ্রেণীর মানুষকে কমবেশী গ্রাম উন্নয়নমূলক সংগঠনে জুড়তে পারলে সে প্রকল্প বা প্রতিষ্ঠানেরও মূল্য বেড়ে যায়, স্বীকৃত প্রকল্প হিসাবেও সুনাম পায়।

প্রকল্পের অগ্রগতি সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধেও যথাযথ মূল্যায়ন করা দরকার। এক কথায় সংস্থার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়েও আলোচনা মাঝে মধ্যে করার প্রয়োজন আছে। প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মী দায়িত্ববোধ সমানভাবে নিতে চায়না। যে দায়িত্ব নেয়, সেই বেশী কাজ করে যায়। যারা দায়িত্ব নেয়না, তারা কাজও ঠিকমত করে না। এই সমস্যাকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। সব থেকে দুঃখের কথা হল, যে সমস্ত কর্মীরা জীবন পণ করে কাজ করলেন, কিছু গড়ে তুললেন, হঠাৎ তাদের কিছু বিপদ বা দুর্ঘটনা হলে, বা কাজ করতে করতে শারীরিক ভাবে অক্ষম হলে তাকে বা তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। চলে যাবার সময় সে প্রতিষ্ঠান থেকে কোনরকম সাহায্য পায় না। তার কথা কেউ ভেবেই দেখে না। তাই সমষ্টিগত কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যক্তিকে ঠিকমত দেখতে না পারলে

সে সমষ্টিকে দেখবে কেমন করে? এইসব সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে যারা এতদিন কর্তৃত্ব করে আসছেন তারাই চিরকাল কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করে। নতুন তাজা মুখ সচরাচর নেতৃত্বে দেখা যায় না। নতুন শক্তি, নতুন চিন্তাধারার পলিমাটি সংগঠনে প্রবেশ করলে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলি ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে উর্বর ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে।

এইসব প্রতিষ্ঠানের আর একটা বড় ত্রুটি হল বলিষ্ঠ দক্ষ নেতার অভাব। সবাই কর্তা সেজে বেড়ায়। সত্যিকার সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার মত যোগ্য নেতৃত্বের বা সংগঠকের একান্ত প্রয়োজন। পারস্পরিক হিংসার প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের বা প্রকল্পের অর্জিত সম্পদ নিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রত্যেকেই ভাবে ও বেশী ভোগ করছে বা সে বেশী ভোগ করছে। এভাবে উঁচু তলায় মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। পরে তা তুল-কালাম অশান্তিতে পরিণত হয়। ফলে হয়ত প্রকল্পই বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক, সংগঠন মজবুত হলে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলেও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। নিটোল সংগঠনই গ্রাম উন্নয়নের প্রথম ও শেষ কথা। সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে এবং তাকে ক্রমাগত ঝালাই ও মাজা ঘসা করতে হবে।

এখানে যা কিছু আলোচিত হল, তা গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করার ধাপ মাত্র। যারা আরও কয়েকটি ধাপে এগিয়েছেন তাঁরা আরও বেশী জানতে পারবেন। এবং আরও বলিষ্ঠ সংগঠনের দিক, উন্নয়নের দিকগুলি খুলে দিতে পারবেন। গ্রামোন্নয়নের কাজে ধীরে চলাই ভাল। চেষ্টা ছাড়লে চলবে না। ক্রমশঃ এগিয়ে যেতেই হবে। সে চলার সীমা পরিসীমা নেই। সমষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে উদ্দেশ্য সফল করার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। এর চেয়ে সোজা আর সংক্ষিপ্ত কোন পথ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

দ্বাদশ পদক্ষেপ

সংগঠনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ ঃ

গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলাও আবশ্যক। গ্রাম্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মেলা, কৃষি প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজনও সংগঠনের পক্ষে প্রয়োজন। এতে গ্রামবাসীরা উৎসাহ পাবে। কিছু শিখবে। নিজেদের সমাজকে দেখতে শিখবে। পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশায় তাদের সংগঠন আরও সুদৃঢ় হবে। তাদেরকেও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এভাবে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রেরণা ও উৎসাহ তারা পাবে। তাদের মধ্যে সুপ্ত শক্তি ক্রমশ জাগাতে হবে। স্থানীয় সমস্যাকে নাটক, যাত্রা, পুতুলনাচ, পোষ্টার, থিয়েটার, গান ইত্যাদির মত গণমাধ্যমের সাহায্যে তুলে ধরে গণ চেতনাবোধ জাগ্রত করার বিশেষ দিক খুলে দিতে হবে। যার যা প্রভিভা আছে সে তা প্রকাশ করার সুযোগ পাবে। গ্রামের বিভিন্ন উৎসবগুলিকেও আরও প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে গ্রামবাসীর জীবনে নানারকম বৈচিত্র্য এলে তারা একঘেঁয়েমির হাত থেকে রেহাই পাবে।

গ্রামে গ্রামে তরুণদের খেলাধুলার রেওয়াজ নিয়মিত রাখতে হবে। ফুটবল, ভলিবল, সাঁতার, কাবাডি, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি খেলাধুলার প্রতিযোগিতা গ্রামে শুরু করা যেতে পারে। এসব খেলাধুলা পরিচালনার দায়িত্ব পেলেও তারা কাজ করতে শিখবে। তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশও ঘটবে। এমন খেলাধূলার প্রচলন করা দরকার যাতে বুদ্ধি বাড়ে, দৈহিক পরিশ্রম হয়, শরীর সুঠাম হয়। গ্রামে একজন ভাল খেলোয়াড় তৈরী হলে সে হবে দেশেরই সম্পদ। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকতে পারে না। এভাবে দেশের তরুণ প্রাণশক্তিকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়।

সঙ্গীতও গ্রাম সংগঠনের মস্ত বড় হাতিয়ার। সঙ্গীত মানুষকে কাছে টানে। সঙ্ঘবদ্ধ করে। মানুষের চিরন্তন ভালবাসা ও আকর্ষণ সঙ্গীতের মধ্যেই আছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান বা কাজ করতে করতে গান দুই-ই দরকার। মানুষকে সংগঠনের আওতায় বেঁধে রাখতেও সঙ্গীতের ভূমিকা অসামান্য। গ্রাম বাংলায় বাউল যখন গান গায়, কত মানুষ তার কাছে জড় হয়। কত ভালবাসে। গণ সংগঠনের নির্বাচিত গানগুলি সমবেতভাবে গাইতে পারলেও একতাবদ্ধ জনচেতনার সৃষ্টি হয়। সব কিছুই আমাদের বক্তৃতা দিয়ে বোঝাবার দরকার নেই। ঠিক কথা, সত্যি কথা, কাজের কথা, গানের মাধ্যমে মানুষকে সঞ্জীবিত করতে পারে। কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

আমাদের গ্রাম বাংলায় কত প্রতিভাবান গায়ক-গায়িকা রয়েছেন। কত শিল্পীমানুষ চমৎকার খোল, তবলা, মাদল, হারমোনিয়াম, বাঁশী বা দোতারা বাজিয়ে গান করেন। তারা সুসংগঠিত নয় বলে যথাযথ পারি-শ্রমিক/সম্মান পান না। উন্নয়নমূলক কাজে তাদেরও সংগঠিত করতে পারলে সংগঠন মজবুত হয়। এইসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুণী মানুষদের গ্রাম উন্নয়ন কাজে খুবই প্রয়োজন। এরা গণচেতনার-গণজাগরণের গান গেয়ে মানুষকে প্রেরণা উৎসাহ ও চেতনা যোগাতে পারেন। সহজ উপায়ে মানুষের চিত্ত জয়ের এই সুবর্ণ সুযোগ গান বাজনা ছাড়া অন্য কিছুতে খুব কমই আছে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার এমন চমৎকার মাধ্যম আর নেই। তাই গান বাজনা, গ্রামীণ সংস্কৃতির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম মাধ্যম ও সংগঠনের মস্ত বড় হাতিয়ার এবং তা করতে হবে পরিকল্পনা মাফিক।

ত্রয়োদশ পদক্ষেপ

গ্রামোন্নয়নে প্রচার মাধ্যমের (Media) ভুমিকা কম নয় ঃ

আমাদের দেশের রেডিও, টেলিভিশান, দৈনিক সংবাদপত্র, পত্র পত্রিকা, সিনেমা, নাটক— এইসব প্রধান প্রচার ও গণমাধ্যমগুলি যদি গ্রামের গভীর সমস্যা, উন্নয়ন ও সরকারী বেসরকারী কার্যপ্রকল্পের কথা দেশবাসীর সামনে নিয়মিত তুলে ধরত তা হলে এদেশের গ্রাম ও তার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের চেহারা-চরিত্র একটু অন্যরকম হত। সেই সঙ্গে প্রয়োজন আন্তরিকতা, ভালবাসা, বাস্তবভিত্তিক চিন্তাভাবনা ও তার বাস্তবায়নের। যে সব স্বেচ্ছাসমাজসেবী সংস্থা নিজেদের একক প্রচেষ্টায় গ্রামোন্নয়নমূলক কাজ এদেশের গ্রামগঞ্জে করার চেষ্টা করছে তারা উল্লিখিত ঐ প্রচার মাধ্যমগুলোতে নিজেদের কথা বলার সুযোগ খুব কমই পায়। রাজনৈতিকভাবেই বা বিশেষ গোষ্ঠীগতভাবেই নয়, অরাজনৈতিকভাবেও গ্রামের যেসব সত্যিকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হচ্ছে তারও ব্যাপক প্রচার দরকার। বেসরকারীভাবে গ্রামোন্নয়নের যে সমস্ত কাজকর্ম চলেছে তার প্রসারের জন্য দেশজোড়া প্রচার ও তথ্যায়ন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য সার্থক সমাজ উন্নমূয়নলক কাজকর্মে লিপ্ত আছে। অথচ এ দেশের অধিকাংশ মানুষই সেসব কর্মকাণ্ডের খবরাখবর জামতে পারেন না মূলত শহরমুখীন সরকারী বেসরকারী শক্তিশালী গণমাধ্যমগুলির উপেক্ষা বা উদাসীন মনোভাবের জন্য। এদেশের সরকারও যদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ও প্রচারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন বা উন্নয়নের কাজে পুরোপুরি মদত দেন তাহলে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টা মিলেমিশে হতশ্রী ও অনুন্নত গ্রামগুলোর চেহারা পাল্টাতে পারে। গ্রামমাধ্যমের প্রচারকার্য গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া গ্রামবাসীরা সেইসব

প্রচার মাধ্যমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে নিজেদের মতামত সকলকে জানাবারও সুযোগ পাবেন। সর্বোপরি দেশের প্রায় সত্তর শতাংশ অধিবাসীর কথা সাধারণ্যে প্রচারের ফলে গ্রামোন্নয়নের কাজকর্ম সবার কাছে স্বীকৃতি পাবে।

বাস্তবে বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান, সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা যৎসামান্যই পেয়ে থাকে। উপযুক্তভাবে যেটুকু পাওয়া উচিত বা পাওয়া যায় তাতেও নানা ঝুটঝামেলা, টাল-বাহানা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আন্তরিক গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টা এদেশের বেশির ভাগ নেতা বা সরকারী আমলারা বাঁকা চোখেই দেখে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, সরকারের এত অঢেল টাকা পয়সা, যন্ত্রপাতি, লোকবল, বিশেষজ্ঞদল তারাই গ্রামের উন্নয়ন করতে পারছে না ; সেখানে স্বেচ্ছা-সেবী সংস্থাগুলো সীমিত ক্ষমতা, যৎসামান্য অর্থবল নিয়ে কিভাবে অনুন্নত গ্রামগুলোর পাহাড়-প্রমাণ সমস্যার সমাধান করবে ? এখানেই তাদের বিচার বিশ্লেষণের গলদ। সরকারের এতকিছু সম্পদ থাকলেও কর্মীদের মধ্যে নেই আন্তরিকতা, ভালবাসা, নিষ্ঠা। সরকারী কর্মচারীদের আগ্রহ টি. এ., ডি. এ, পে-স্কেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র দশটা-পাঁচটার মধ্যে এতসব কাজ সম্পন্ন করাও সম্ভব নয়। এছাড়া সরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে নেই কোন যোগাযোগ বা কো-অরডিনেশন। একে অপরের খবরাখবর রাখে না। রাখার চেষ্টাও করে না। পরিষ্কার বলে দেন, এ কাজ তার বা তাদের বিভাগের এক্তিয়ারে নয়। সরকারের একটা বিভাগ একটা নিয়ম জারী করলে অন্য বিভাগ তাতে বাধা দেয়। কর্মচারীদের স্বচ্ছল ভরণপোষণ যাতে ঠিক থাকে তার জন্য সারা বৎসর ধরেই সংস্থাগুলোয় (সরকারী) চলে নানা দাবীদাওয়া, আন্দোলন, মিছিল, মিটিং ধর্ণা ইত্যাদি। ঐ সব হৈ-হুল্লোরের শব্দে গ্রামোন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা চাপা পড়ে যায়। এই জন্যই সরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো কোন দীর্ঘস্থায়ী গঠনমূলক কাজ করে উঠতে পারছেন না। মাঝে মধ্যে মন্ত্রী ও নেতাদের মুখ ফস্‌কে এই স্বীকারোক্তিও বেরিয়ে আসে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে 'জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' সবই করতে হয়। আর্থিক সঙ্কট হেতু তারা দক্ষ-অদক্ষ কোন ধরনের কর্মীকেই দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারেন না। তরুণ কর্মীরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই ভাল চাকুরী পেলেই সংস্থা ছেড়ে চলে যান। তা সত্ত্বেও নানা আত্মত্যাগের মধ্যে এইসব কর্মী যে নিষ্ঠা সহকারে সংস্থাকে তথা গ্রামকে মন প্রাণ ঢেলে গড়ে তোলেন তাতে গ্রামবাসীরা সর্বদা সংস্থার পাশে পাশে থাকে। সংস্থাকে ভালবাসে। তৈরী হয় এক পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক। প্রচারকার্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীদের বাইরের কারুর উপরে ভরসা না করেই গ্রাম উন্নয়নের ধারাবাহিক সংবাদকে বিভিন্ন শক্তিশালী গণ মাধ্যমের দপ্তরে নিজেদেরই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের সকলের সাথে যোগাযোগ করার এটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সংস্থার সাথে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতে হবে। এতে তেমন সাড়া না পেলেও বাস্তবজ্ঞান বাড়বে। পরে সামর্থ্যমত নিজস্ব সংবাদ মাধ্যম সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক গণ-সংযোগ-বিজ্ঞান (Mass Communication Science) একটু আধটু জানতে হবে।

চতুর্দশ পদক্ষেপ ঃ

আদিবাসী সমাজে গ্রামোন্নয়ন ঃ

ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজে যে সমস্ত অবহেলিত সম্প্রদায় আছে, তাদের মধ্যে আদিবাসীরাই দরিদ্রতম। এদের নিজস্ব যে সমাজনীতি ও সংস্কৃতি আছে তা বজায় রাখার পক্ষপাতী বলেই এরা সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে জোটবদ্ধভাবে নির্জন কোন পাহাড়ী বা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর মানুষ এদের সহজে বিরক্ত করতে না পারে। এদের জীবনযাত্রাও বিচিত্র। অশিক্ষা,

কুসংস্কার, উৎসব, মাদল বাজিয়ে হৈ-হল্লা, যা হোক ভাবে জীবন ধারণ করা এদের রীতিনীতি। তবে নিজেদেরকে স্বাধীনভাবে রাখতে চাওয়াই এদের আসল কথা। এরা কারুর পক্ষপাতিত্ব করা পছন্দ করে না। নিজেদের ব্যাপারে এরা জোটবদ্ধ। খুব কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমী মানুষ। প্রাচীন রীতিনীতিগুলোকে আকড়ে থাকতে ভালবাসে। অশিক্ষার প্রভাবে নতুন সব কিছুতেই ভয় পায়। এর একটা বড় কারণ, ভিন্ন সমাজের মানুষ এদের সাথে মেলামেশা করলে তারা সহজেই এদের ঠকাবার সুযোগ পেয়ে যায়। অপরের কাছে ঠকে ঠকে আজ এরা অনেকেই সর্বহারা হয়েছে। অথচ মনের দিক থেকে এরা উদার, সহজ সরল মানুষ। ধর্ম্মভীরুও বটে। পারতপক্ষে অপরের জিনিস এরা আত্মসাৎ করতে চায় না। মিথ্যে কথা বড় একটা বলে না। তাই অন্য জাতির তুলনায় এদের নিয়ে সমাজ উন্নয়নের কাজ করতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। এদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে এরা সে বিশ্বাসের পুরোপুরি মূল্য দেয়। পশ্চিমদিনাজপুর অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে গ্রামউন্নয়নমূলক কাজ করতে গিয়ে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাই এখানে জানালাম। কোথাও এর ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলার আদিবাসীদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি একইরকম দেখে এসেছি। সবচেয়ে গরীব শোষিত অবহেলিত পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে ভারতীয় আদিবাসীদের স্থান অগ্রগণ্য। ফলে এদের উন্নয়নের দিকে আমাদের বেশী করে নজর দিয়ে আর্থিক, সামাজিক দিক থেকেই ওদের স্বাবলম্বী করে তোলা উচিৎ। সভ্য সমাজের মানুষরা এদের যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত করে, দাস করে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছে। এদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আজ একান্তভাবেই প্রয়োজন আছে।

গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ এমনই এক সৃষ্টিমূলক কাজ যেখানে সব ধরনের মানুষেরই প্রয়োজন। অর্থনীতির কাজটা বড় করে দেখলেও ধর্মনীতিকেও উপেক্ষা করা যায় না। ধর্মকেও উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে

যুক্ত করে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এদেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মাশ্রয়ী। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক ব্যাঘাত সহজেই এদেশে সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং এদিকটা সম্বন্ধেও গ্রাম উন্নয়ন কর্মীদের সচেতন থাকতে হবে। ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন ভাবে চলার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। কাউকে জোর করে কোন বিশেষ ভাবে টেনে আনা অনুচিৎ।

পঞ্চদশ পদক্ষেপ ঃ

সমস্যার মূল বা প্রতিপক্ষ কে ?

আলোচিত গ্রামোন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের পাশাপাশি. এমন কিছু মানুষ গ্রামে পাওয়া যাবে যারা কৃষিজীবি নন। এরা ছোট-খাটো ব্যবসায় বা কুটির শিল্পের কাজ করে জীবিকা অর্জন করে থাকে। এরা নিরক্ষর, কুসংস্কারে আবদ্ধ। চুরি, ডাকাতি এবং খুনেতে অভ্যস্ত। নেশাখোর, মাতাল, অকৃতজ্ঞ, হুজুগে, ভীতু, মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর ; পেটের কথা ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করতে পারে না। এক কথায় মানবিক গুণ বলতে কিছুই নেই। থাকলেও তা সুপ্ত অবস্থায় আছে। এদের নিজস্ব সত্বা বা স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও খুব একটা নেই। গ্রামের মহাজন মাতব্বরদের লেজুড় ধরে এরা চলে। মহাজন ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে চেনেনা। নিজেদের মধ্যেও কোন সংগঠন বা একতার বালাই নেই। সংগঠনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তাও বোঝে না। চিরকাল জেনে এসেছে—ওরা দাস হয়েই জন্মেছে, পরের খিদমত খাটার জন্য। ফলে মহাজন ও বাবু শ্রেণীর লোকজনদের অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার এরা নীরবে সহ্য করেই চলেছে। মহাজনদের এরা ঈশ্বরের মতন ভক্তি করে থাকে। মহাজনদের সম্মান বাড়ায় এরাই। অথচ নিজেরা দুমুঠো খেতে পায় না। এইসব গরীব মানুষের অর্থনৈতিক জীবন যেন হাজার ফুটোযুক্ত কলসী। এক কথায় এদের ভয়াবহ চরম এক অবস্থা।

এত দোষ ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও যদি এইসব সর্বহারাদের সংগঠিত করা যায়, সেটাই হবে সংগঠনের পক্ষে বড় সাফল্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই মানবিক শক্তি লুকিয়ে আছে। শুধু তাকে বের করে আনার কলা-কৌশল জানা চাই।

গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ প্রকৃতপক্ষে যাদের নিয়ে করা হয় তারা হল এই সর্বহারারই দল। এরা সংখ্যায় বেশী হলেও সব দিক থেকেই দুর্বল, ভীতু, অসহায় মানুষ। এরা আবার যাদের কাছ থেকে উপকার বা সাহায্য পাবে তাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করবে। সামান্য জিনিষ পেলে এরা সহজেই বশীভূত হয়ে পড়ে। এই রকম অদ্ভুত ও পরস্পরবিরোধী মানুষদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসযোগ্য মানুষ গ্রামোন্নয়নের জন্য খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। আসলে সমাজের কাছ থেকে দিনের পর দিন এঁরা নানা-ভাবে শোষিত, নির্যাতিত হয়েছে বলেই এদের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনাবোধ খুবই কম। এদের নিয়ে তাই কাজকর্ম করার সময় সেভাবেই সংগঠন কর্মীদের মনকে গড়েপিটে নিতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এদের বাস্তবশিক্ষা দিতে হবে। তারা কে? তারা কিভাবে বাস করবে? কিভাবে ন্যায্য অধিকার পাবে? কিভাবে নিজেদের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষা করবে? কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে? কিভাবে যৌথভাবে কাজকর্ম করবে? কিভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবে? কারা তাদের আসল শত্রু? এইসব ব্যাপারে এদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ কাজ খুবই শক্ত ও সমস্যাপূর্ণ। প্রথম প্রথম 'এসব কেউ শিখতে চাইবেনা। বরং মন্তব্য করবে—দূর এসব শিখে কি হবে? এসব দেখে যে কর্মীরা হতাশ হবে, দুঃখ পাবে, কাজ ছেড়ে দেবার কথা চিন্তা করবে, তাদের কাজ ছেড়ে দেওয়াই উচিত। এইসব কর্মীদের দিয়ে গ্রাম উন্নয়নমূলক কঠিন কাজ করানো অসম্ভব। ধৈর্য, নিষ্ঠা, ভালবাসা দরকার। এসব মানুষদের সত্যিকার এক একটা সংগঠন যতদিন না গড়ে ওঠে ততদিন কোন রকম সামাজিক অগ্রগতির সংগ্রাম করা যাবে না। শোষক জোতদারদের

দাপটই গ্রামে বজায় থাকবে। তারা চাইবে গরীবদের সংগঠন ভেঙ্গে দিতে এবং একাজে গরীবদেরই তারা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে। গরীব মানুষ এতই উদাসীন, অজ্ঞ, যে তারা মারামারি করে নিজেরাই জখম হবে। এ ঘটনা আজও দেশে সমানভাবে ঘটে চলেছে।

এইসব জোতদার মানুষগুলো এক সময় জমিদারীর দাপটে অত্যাচার করেছে। আজ মুখোশ পাল্টে হয়েছে জোতদার, মুনাফাখোর, বড় ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ, মোড়ল, মাতব্বর বা তথাকথিত গ্রাম্য নেতা। এদের মুখোশই পাল্টেছে, চরিত্র পাল্টায়নি। দেশের সব রকম বড় বড় পদেও এদের আসন অটুট আছে। এদের জায়গায় সত্যিকার যোগ্য কোন মানবদরদী মানুষকে বসাতে যে সংগ্রাম করার দরকার তার জন্য ভারতবর্ষ এখনও প্রস্তুত নয়। সে রকম প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতে এ ধরনের সংগঠন গড়ে উঠুক। নতুন সমাজ গরীবদের নিয়ে তৈরী হোক। আমরা তাই চাই। প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পথও তাই। সাম্যবাদের ফলশ্রুতি এই সংগঠনের মাধ্যমেই আসবে। প্রথমে তাই ছোট করে কোন এক জায়গায় সংগঠনের কাজ শুরু করা হল। পরে তা বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। গ্রাম উন্নয়নের কাজে গ্রামের বিচার, সালিসীর বিষয়টাও এসে পড়েছে। কাজ করতে করতে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস ও আনুগত্যবোধ যতো বাড়বে ততই গ্রামবাসীরা সব ধরনের কাজের জন্য প্রকল্পের কাছেই ছুটে আসবে। এ কাজটাও গ্রাম কমিটির মাধ্যমে করা ভাল। যদি তারা কোন জটিল ব্যাপার মীমাংসা করতে না পারে, তখন প্রকল্পের কর্মীরা তাদের সাহায্য করতে পারে। প্রথমে গ্রামবাসীকেই তাদের সমস্যা দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। এই বিচার সালিসী গ্রামের মধ্যেই মিটিয়ে ফেললে গ্রামের প্রভূত উপকার হয়। গ্রামবাসীরা এমনি কিছু পারুক আর না পারুক, সামান্য কারণে মামলা করতে পটু। তারা জমি বিক্রী করেও মামলা চালায় এবং নিঃস্ব হয়। মৌখিক মীমাংসার পথে যেতে চায়না। এই জেদটা ওদের অর্থনৈতিক পঙ্গুতার অন্যতম কারণ। গ্রাম কমিটির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান

হলে গ্রাম কমিটি আরও বলিষ্ঠ হবে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা দূর করলে গ্রামবাসীরা উন্নতি করতে পারবে। তাদের অর্জিত কষ্টের পয়সা অন্যের পকেটে চলে যাবে না। এভাবে গ্রামবাসীদের মানসিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করতে হবে। প্রাথমিকভাবে তাদের গ্রামীণ ও সরকারী-আইন প্রশিক্ষণও দিতে হবে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে দেশের আইন বিষয়ক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। তাদের অধিকার এবং কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার খুব দরকার আছে।

ষষ্ঠদশ পদক্ষেপ

গ্রামোন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও মূল্যায়ন

সব কাজেরই মূল্যায়ন অপরিহার্য। কোন কাজেরই মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ না করলে সে কাজের দোষত্রুটি ধরা যায় না। কাজও আশানুরূপ হয় না। মূল্যায়নের ফলে কাজের ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতাও ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় করে। কি করা হচ্ছে? তার কতটুকু সম্পন্ন হোল? সম্পন্ন হতে পারল না-ই বা কেন? আর কিভাবে সম্পন্ন করা যেত? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করলে নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে। সেই তথ্যকে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে পদক্ষেপ নেওয়াও সহজ হবে। গ্রাম উন্নয়নমূলক কাজ এমনই সার্বিক উন্নয়নের কাজ যেখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ সব কাজের পরিস্কার ছবি পেলে তবেই কাজের সুন্দর একটা ধারা বহমান থাকবে। যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তাই মূল্যায়নের ভিত্তিতে কাজের ও লক্ষ্যেরও গতি সংশোধন করা দরকার।

একটি মানুষের জীবনদর্পণই তার সব কিছু। অতএব সংগঠন কর্মীকেও মনে রাখতে হবে যে তার কর্মীদের কথাবার্তা, আচার ব্যবহার,

সততা, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ, কাজ করার ক্ষমতা সব কিছুর মধ্যেই তার নিজের ছবি পরিস্কার ফুটে উঠবে। সে নিজ জীবনে কতটুকু আদর্শ পালন করছে তার উপর তার সংগঠনের অনেক কিছু নির্ভর করছে।

যে মানুষ মুখে এক বলে, অথচ কাজে অন্যরকম করে, তার সম্মান বজায় থাকে না। তার উপর লোকের বিশ্বাসও থাকেনা। যে নেতা মুখে যা বলেন কাজেও তা করার চেষ্টা করেন সেই মেতার নেতৃত্ব স্থায়ী হয়। বলিষ্ঠ জীবনদর্পণই মানুষকে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। সামঞ্জস্য রক্ষা করে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। হতাশ ব্যক্তির কাছে সদর্থক কিছু প্রত্যাশা না করাই ভাল।

গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে কারুর কোনরকম উৎসাহ ও প্রেরণা আশা না করাই ভালো। এসব টাকা / পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। এখানে উত্তেজনা নেই, পুরস্কার নেই, খ্যাতি নেই। সাধারণ সমাজে দহরম-মহরম করার কিছু নেই। অথচ আছে ব্যর্থতা, সীমাহীন সমস্যা, দুর্ণাম, নিন্দে —এককথায় যা কিছু খারাপ সব।

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ মানুষ সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকে পাগলামি বলে ভেবে থাকেন। ওরা বলেন 'যাদের মাথায় ছিট আছে, ভীমরতি ধরেছে, বদ্ধ উম্মাদ, তারাই ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াচ্ছে। মিথ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যাদের তিন কুলে কেউ নেই, কিছু করার নেই, তারাই এসব করে।' তাই বলছি, এ কাজে স্বীকৃতি নেই, পুরস্কার নেই, পয়সা নেই—কিছু নেই। অসম্ভব ধৈর্য্য ও নিষ্ঠাসহকারে গ্রামোন্নয়নের মত কঠিন কাজে টিঁকে থাকাটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার। চলতি সমাজের সঙ্গে কোন দিক থেকেই এর মিল পাওয়া যাবেনা। অনেকে গ্রাম উন্নয়ন কাজের কথা শুনলে বলে 'তোমাদের জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। কুসংস্কারে আবদ্ধ, অশিক্ষিত মানুষগুলিকে নিয়ে তোমরা পাগলামি শুরু করেছো। সংগঠন ও আদর্শবাদী মনকে এরা ভেঙে দেয়, নষ্ট করে দেয়। অবশ্য এ সমাজের সকলেই যে জোলো, হৃদয়হীন,

তা নয়। সমাজের অনেক সংবেদনশীল মানুষ গ্রাম উন্নয়নের কাজকে উৎসাহ দেন, প্রেরণা জোগান, সাধ্যমত সহযোগিতাও করে থাকেন। এইসব মুষ্টিমেয় মানুষদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতাকে পুরস্কার বলে মনে করতে হবে। তাদের নৈতিক সহযোগিতাও আমাদের চলার পথে পাথেয়। এরাই আমাদের প্রেরণা ও উৎসাহ। তবে আসল কথা হল নিজেদেরকেই নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রেরণা ও উৎসাহের মূল চাবিকাঠি করতে হবে।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ প্রকৃত সংগঠনকর্মীরাই আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করে তুলবেন। ক্রমশঃ তাকে জাতীয় স্তরে—কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক, কি রাষ্ট্রনৈতিক উন্নয়নের সব ব্যাপারেই বিস্তৃত করে ফেলতে হবে। আমাদের আজ এমন ধরনের সরকার এদেশে চাই, যে সরকার গরীব মানুষের ভবিষ্যতের আশার আলো হবে। সেই সরকারের রাজত্বে সবাই ন্যূনতম ভদ্রস্থ, উপযুক্ত আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষা পাবে। এ সরকার হবে নীতি নির্দ্ধারণে কঠোর প্রগতিশীল, সত্যিকার কর্মব্যস্ত সরকার, নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণের উল্লেখযোগ্য রূপকার ও ভারতীয় জনগণের সম্মানজনক জীবনযাত্রার মুখ্য পরিচালক এবং জনগণের সুখ দুঃখের সত্যিকার সংবেদনশীল বাবু। এ ধরনের সরকার ভবিষ্যতে হবে কিনা জানিনা। তবুও দেশের স্বার্থে, বিপুল গরীব মানুষের স্বার্থে আমরা বুকে আশা নিয়ে কাজ করে যেতে পারি। বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসমাজসেবী সংস্থার একটা লক্ষ্য ও আদর্শবোধ আছে। তাদের কর্মীরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। তাদের কাজের প্রত্যক্ষ ফলাফল জনসাধারণের মধ্যে দাগ কাটে এবং তাদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করে। সত্যিকার অর্থনৈতিক মুক্তি আসে এবং একটা চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বেঁচে থাকার মাপকাঠিও হল সত্যিকার কাজের সংস্থান গড়ে তোলা।

●

সংযোজন [৩৫ পৃষ্ঠার ২৫ লাইনের পর]

বাজার

কৃষি ফসল যখন উৎপাদন হয়—সেই মুহূর্তে বাজার পড়ে যাচ্ছে। চাষীদের নামমাত্র মূল্যে তাদের সারা বছরের কষ্টের ফসল বিক্রী করতে হচ্ছে। জিনিষ চলে যাচ্ছে গ্রামের বাইরে, চাষীর ঝুলিতে তেমন কোন অর্থ আসছে না। এজন্য চাষের কাজে উৎসাহ, প্রেরণারও অভাব ঘটে যাচ্ছে। শুধুমাত্র যথেষ্ট ফসল ফলালে হবে না- সেইসব ফসল বাজার-জাত করার জন্য চাই--সুনিয়ন্ত্রিত গ্রামীন বাজার—যা গ্রামে একেবারেই প্রায় দেখা যায় না। সরকার যদি গ্রামের এবং শহরের অঞ্চলে অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে কো-অপারেটিভ বা নিয়ন্ত্রিত বাজার তৈরী করতে পারেন এবং চাষীরা যদি ফসল ফলিয়ে ন্যায্য দাম পায়—গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে বাধ্য। হক কথা হল, বাজারের উপর উৎপাদন নির্ভরশীল। বাজার উৎপাদন ও আর্থিক উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রিত করে।